نخبة الفكر

খৃ ২০১৪ - হি ১৪৩৫

খিলাফতের অন্তরালে

শাইখ উমর বিন মাহমূদ আবূ উমর

- আবু কাতাদাহ (হাফিযাহুল্লাহ) -

আল-ফজর প্রকাশনী

بسم الله الرحمن الرحيم

খিলাফতের অন্তরালে

শাইখুল মুজাহিদ ওমর বিন মাহমুদ আবু ওমর
আবু কাতাদাহ ফিলিস্তিনী
(আল্লাহ তায়ালা শাইখের মুক্তিকে তরান্বিত করুন)

রমাযান ১৪৩৫ হিজরী – জুলাই ২০১৪ খৃষ্টাব্দ

আল-ফজর প্রকাশনা

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على محمدٍ الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعدُ:

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা’আলার যিনি গোটা বিশ্বজগতের প্রতিপালক। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মদ (সাঃ), তাঁর পরিবার ও সাহাবিগণের (রাঃ) উপর। অতঃপরঃ

“ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক এন্ড শাম” নামের দলটির দাবি এখন সবার নিকট প্রকাশ হয়ে গেছে এবং সবখানেই তাদের ঘোষণা ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের দাবি, তারাই হচ্ছে জামাআতুল মুসলিমীন (মুসলিমদের জামা’আ), অর্থাৎ তারা দাবি করছে তাঁদের দলই হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর একমাত্র বৈধ জামা’আ; তারা হচ্ছে বৃহত্তর ইসলামি খিলাফাহ, আর এবং তাদের আমীর হচ্ছে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর নেতা (খালিফাহ)। এই বিশ্বাস ও ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করেই তারা সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে আহবান জানিয়েছে তাদের আমীরকে বাই’য়াহ (আনুগত্যের শপথ) দেয়ার জন্য। এধরণের একটি পদক্ষেপ তারা নিতে যাচ্ছে এটা শামের ভাইদের মাধ্যমে আমি আগেই আনতে পেরেছিলাম। এ ভাইরা আমাকে বেশ কয়েকবার অনুরোধ করেছিলেন[১] এ পদক্ষেপের ব্যাপারে ইসলামী শরিয়তের অবস্থান কি তা ব্যাখ্যা করার জন্য। ইতিপূর্বে, ধৈর্যের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী আমাদের সম্মানিত শায়খ আবু মুহাম্মদ আল মাকদিসিও আমাকে এই বিষয়ে কিছু লিখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। শাইখ আল-মাকদিসি এই অনুরোধ জানিয়েছিলেন যখন তার কাছে নিশ্চিত খবর পৌঁছল যে, এই দলটি তাদের এবং জাবহাত-আন-নুসরাহ[২] এর মাঝে চলমান দ্বন্দ্ব মিটিয়ে

ফেলার আহবান প্রত্যাখ্যান করেছে এই বলে যে, “তারা হচ্ছে স্টেট বা রাষ্ট্র। শরিয়তে কিংবা ইতিহাস থেকে একথা কখনও প্রমানিত নয় যে, কোন ‘রাষ্ট্র’ মীমাংসার জন্য রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কারও সাথে (অর্থাৎ কোন দলের সাথে) আলোচনায় বসে (মুলত এটা তাদের মিথ্যা দাবি এবং স্পষ্ট গোমরাহী)। তাই যে সকল ভাইয়েরা আমার কাছে এসেছে আমি তাদের বলেছি, এই তথাকথিত রাষ্ট্রের (দাউলাহ) মাঝে মূলত ২টি দিক দিয়ে গোমরাহি প্রবেশ করেছেঃ-

এই দলের (জামাআতুল বাগদাদি) মধ্যে গোমরাহ প্রবেশ করেছে, প্রথমতঃ “জামাআতুল খিলাফাহ/জামাআতুল মুসলিমিন”[৩] নামক দলের মুরগিদের মাধ্যমে। এটা (“জামাআতুল মুসলিমীন”) এমন এক জামাত যাদের মাঝে শুরু থেকেই অজ্ঞতা স্পষ্ট। তারাই (“জামাআতুল মুসলিমীন”) প্রথম এই ভ্রান্ত দাবি করেছিল যে, খালিফাহ তখনই বাস্তবতায় পরিণত হবে যখন মুসলিমরা আহলে বাইতের কোন একজন ব্যক্তিকে (অর্থাৎ নবীজি সাঃ এর কোন বংশধরকে) বাই’য়াহ দেবে। তখনই নাকি এই মহান ঘোষণার শার’ই ভিত্তি তৈরি হয়ে যাবে। নিঃসন্দেহে তাদের ছড়ানো এই ভ্রান্ত ধারণা এবং ঘোষণা অত্যন্ত অনিষ্টকর। এবং তাদের (জামাআতুল মুসলিমীন) সাথে আমার লম্বা আলোচনা হয়েছে, যেখানে তারা এমন সব কথা বলেছে ও যুক্তি এনেছে যা থেকে, তাদের অজ্ঞতা যেকোন শিক্ষানবিশের নিকট স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা। আর যেকোন অভিজ্ঞ তলিবুল ‘ইলমের কাছেএধরনের ভ্রান্ত ধারণা দাবির মূর্খতা স্পষ্ট হবার কথা।

এই তথাকথিত খালিফার (অর্থাৎ "জামাআতুল মুসলিমীন" নামক দলের আমীরকে) যখন আমার সর্বশেষ কথা হয়, তখন আমি বলেছিলাম। আপনাদের কর্মপদ্ধতি ও পথ হল রাফেজি[৪] ও খারেজিদের পথভ্রষ্টতার সমন্বয়। রাফেজিদের সাথে তাদের মিল হল তারা একটি পদবি এমন একজনকে দিচ্ছে যার কোন অস্তিত্বই নেই। যেমন, রাফেজিরা তাদের ১২তম ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল আসকারির ব্যাপারে বিশ্বাস পোষণ করে থাকে। আর আহলুল ইলমরা রাফেজিদের এই আকিদা ও "ইমামতের" ব্যাপারে তাদের ব্যাখ্যা তথা সংজ্ঞার অসাড়তা ও অসম্পূর্ণতা প্রমাণ করে গেছেন। শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া "মিনহাজ সুন্নাহ আল নববিয়াহ" তে "ইমামত" সম্পর্কে আহলে সুন্নাহর মত ও বিবেক-বুদ্ধির আলোকে যে আলোচনা করেছেন, তার শুরুর দিকের বক্তব্য নিয়ে যদি কোন ব্যক্তি একটু চিন্তা-গবেষণা করে, তাহলেই তার নিকট এই জামাত (জামাআতুল মুসলিমিন) তাদের দাবির ব্যাপারে যে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। আমি তাদেরকে বলতাম, সার্বজনীন বাস্তবতা শব্দগুলোকে তাদের অর্থ দান করে। কোন দাবি বৈধ হবার জন্য তার বাস্তবতা থাকতে হবে। একারণে "খিলাফাহ" শব্দটি, বা "খিলাফাহ" উপাধিটি হল একটি বাস্তব বিষয়, একটি বাস্তবতার জন্য নির্ধারিত নাম। এটা এমন কোন পরিভাষা না যার অর্থ অবাস্তব, কিংবা অসঙ্গত। তোমরা যা করছো তা হল, "খিলাফাহ" শব্দটি ব্যবহার করছো এমন একটি বিষয়ের জন্য যার এখনো কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই, আর তোমরা চাচ্ছো এই শব্দের প্রয়োগের মাধ্যমে যার বাস্তব অস্তিত্ব এখনো নেই তাকে বাস্তবতায় পরিণত করা। একবার বাস্তবতায় পরিণত হবার পরই তার শার'ই ভিত্তি থাকবে তার আগে নয়। [**অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

শাইখের কথার অর্থ হল- জামাআতুল মুসলিমীনের ধারণা ছিল, যদি একজন ক্বুরাইশী খালিফাহ ঘোষণা করা হয়, এবং তারপর যদি দুনিয়ার মুসলিম তাকে বাই'য়াহ দেয়, তাহলে খিলাফাহা প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে। শাইখ আবু ক্বাতাদা বলছেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর অবস্থান, যা হল সঠিক অবস্থান, তা হল “খিলাফাহ” একটি বাস্তব অবস্থার নাম। বাস্তবত একটি অবস্থাকে বোঝাতে “খিলাফাহ” নামটি উৎসারিত। উল্টোটা না। জামাআতুল মুসলিমীনের লোকেরা নিজেরাও স্বীকার করে খিলাফাহ নেই। কিন্তু তারা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পন্থা হিসেবে কি সমাধান বের করলো? একজনকে খালিফাহ ঘোষণা দাও, তাঁকে সবাই বাই'য়াহ দেয়ার মাধ্যমে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করো। অর্থাৎ তারা শব্দটিকে তার বাস্তবতা থেকে বিচ্যুত করলো। ধরুন আপনি মরুভূমিতে একটি জায়গার সামনে সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিলেন যে “এটি একটি প্রাসাদ”। তার পর বললেন, আসো আমরা প্রাসাদ বানানোর কাজ করি। আপনার সাইনবোর্ডের কারণে তো বিরান ভূমি প্রাসাদ হয়ে যাচ্ছে না।] তাদের জবাব ছিল ইমামতের এই শর্তগুলো (আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'র উলেমা ও ফুক্বাহাগণ যে শর্তগুলো নির্ধারিত করেছেন) শারিয়াহর আলোকে প্রমাণিত নয়। এ ব্যাপারে তারা তাৎক্ষনিকভাবে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এই হাদিসটি দলিল হিসেবে পেশ করেঃ

(كلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل)

যেকোন শর্ত যা আল্লাহর কিতাবে নেই তা বাতিল”[৫] (সহিহ বুখারি)

“খলিফা”, “ইমামত”, “ইমারত”[৬] এই শব্দগুলোর সঠিক অর্থ ও বাস্তবতা তাদেরকে বুঝানোর জন্য আমি চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলাম। আমি তাদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম বাস্তব অবস্থার মাধ্যমে, এই পদগুলোর,

এই শব্দগুলোর উদ্দেশ্য অর্জিত হয়, ঘোষণার মাধ্যমে না। একারণে কোন ঘোষণার যদি বাস্তব সত্যতা না থাকে, যদি বাস্তব অস্তিত্ব না থাকে তাহলে সে ঘোসণায় যে শব্দই ব্যবহার করা হোক না কেন [খিলাফাহ, খালিফাহ, ইমামাহ, ইমারাহ] তার কোন শার'ই ভিত্তি থাকে না। তখন সেটা নিছক একটি শব্দ হয় এবং একটি শার'ই বাস্তবতার নাম হয় না। এটা এমন এক বিষয়, যা ছোট বাচ্চারাও বুঝবে। কিন্তু তারা সবসময় একই উত্তর দিতঃ "এই সব তত্ত্ব কথা আমাদের বুঝে আসে না"।

বেশ অনেকবারই আমার তাদের সাথে বসা হয়েছে, অধিকাংশ সময় তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ও দাবির ন্যায্যতা আমাকে দিয়ে স্বীকার করানো। আর আমি তাদের জোর দিয়ে বোঝাতাম, যদি আমরা তোমাদের ব্যাপারে ভালো ধারণা করি, তাহলে তোমদেরকে সর্বোচ্চ মুসলিম উম্মাহর একটি অংশ বলে গণ্য করা যাবে। কিন্তু তোমরাই সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এটা কখনো গ্রহণ করা যাবে না। আর নিজেদের কল্পিত এক দাবির জন্য এই মহান শার'ই পরিভাষার (খিলাফাহ) প্রয়োগের দিক দিয়ে, আপনাদের মতাদর্শ ও মানহাজ রাফেজিদের সাথে মিলে যায়। আর তারাই হচ্ছে এব্যাপারে (ইমামত) লোকেদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মোহগ্রস্থ। কেননা তারা এমন একজনকে ইমাম মনে করে, এবং তার উপর ও তাকে কেন্দ্র করে ইমামতের শার'ঈ হুকুম ও নিয়মাবলী প্রয়োগ করে - বরং তার চেয়েও বেশি কিছু মনে করে - যে কিনা অনুপস্থিত, এবং বস্তুত তার কোন অস্তিত্বই নেই।

আর খারেজিদের সাথে মিলের কথা বলতে গেলে, তাদের সবচেয়ে খারাপ

দিকটিই আপনারা গ্রহণ করেছেন। আর তা হল, যারাই এ ভ্রান্ত ব্যাখ্যার ব্যাপারে আপনাদের সাথে একমত পোষণ করেনি, আপনারা তাদের তাকফির করেছেন (কাফির সাব্যস্ত করেছেন)। এবং তাদের কথিত ‘খলিফা’ এবং ‘প্রধান কাযী’ নিজেরাই আমাকে জানিয়েছে যে, তারা এই আকিদা পোষণ করতো যে- “কোন ব্যক্তি যদি তাদের খলিফাকে বায়াত না দেয় তাহলে সে কাফির”। কিন্তু তাদের কথিত খালিফাহ এবং “প্রধান কাযীর” ভাষায়ঃ “আমাদের এই আক্বিদার এখন পরিবর্তন হয়েছে। যদিও আমাদের কেউ কেউ এখনো এই আকিদা পোষণ করে কিন্তু আমরা (সকলে) এখন আর এটা মেনে চলি না”। তাই তাদের জন্য “বাই’য়াহ না দিলে তাকফির করা” এমন একটি বিষয় যাতে ইখতিলাফ জায়েজ! আর এ ক্ষেত্রে মতভেদ তাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্যের জন্য কোন সমস্যা নয়। আর শুরুর দিকে এই ধরণের বিশ্বাসের জন্যই শুরুর দিকে তারা মুসলিমদের জান-মাল হালাল করার মাধ্যমে তাদের এই অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে।

অবশ্য এখানে আমি তাদের ইতিহাস নিয়ে লিখতে বসিনি, এ ব্যাপারে অন্য অনেকের বক্তব্যের পাশপাশি তাদের নিজেদেরও অনেক স্বীকারোক্তি আছে। তাদের “খলিফাহ” এবং প্রধান কাযী সাথে আমার আলোচনা ভালোভাবেই, বলা যায় সৌজন্যতাপূর্ণ ভাবেই শেষ হয়েছিল, কিন্তু তাদের ব্যাপারে আমার অবস্থান অপরিবর্তিত ছিল তারা জানতো। যদিও আমি জানতাম তাদের কিছু অনুসারী আমার উপর কুফরের ফতোয়া দিয়ে দিয়েছে (অর্থাৎ শাইখকে তাকফির করেছে)। এবং এই লোকদের একজন এই ফতোয়া প্রকাশ্যে প্রচার করতো। সে মাসজিদে

এবং মাজলিসে এই ফতোয়া প্রচার করতো। আমাদের একজন শাইখ যার নাম আবু ইয়াদ, আমাকে না জানিয়ে আমার এবং এই ব্যক্তিরে মাঝে একটি মিটিং এর ব্যবস্থা করলেন। এ ব্যক্তিটি ছিল তাদের (জামাআতুল মুসলিমীন) মধ্যে বয়োঃজ্যেষ্ঠ, এবং তাকে তারা উঁচু ‘ইলমসম্পন্ন মনে করতো। এ ব্যক্তি সবসময় আমার সাথে সাক্ষাৎ, আলোচনা এমনকি দেখা করাও এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতো। তাই যখন শায়েখ আবু ইয়াদের বাসায় তার সাথে আমার দেখা হয়ে গেল, আমি তাকে নিজের পরিচয় দেয়ার আগে সে আমাকে চিনতে পারে নি।

আমার পরিচয় জানতে পেরে সে চলে যেতে উদ্যত হল। কিন্তু আমাদের সজ্জন ও অমায়িক নিমন্ত্রনকর্তা (শাইখ আবু ইয়াদ) একরকম জোর করেই বলতে গেলে, তাকে থাকতে বাধ্য করলেন। আলোচনা শুরু হবার পর, “জামাআতুল খলিফা”-র (জামাআতুল মুসলিমীন) এই শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তি ঘুরে ফিরে শুধু একথাই বলতে লাগল যে, আমি (আবু ক্বাতাদা) কাফির, এবং শাইখ আবু ইয়াদ তা প্রত্যক্ষ করেছেন। আমি তাকে তাকফির সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় (মূলনীতি, প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি) নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কারণ তাকফির ছিল তা সব যুক্তির মূল ভিত্তির একটি। কিন্তু তার মধ্যে অজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছু খুঁজে পেলাম না। এক পর্যায়ে সে ঘামতে শুরু করল, তখন তার জন্য আমার মায়াই হল। তাই আমি ঘরের মালিকের কাছে অনুমতি চাইলাম যাতে তাকে চলে যেতে দেয়া হয় আর শেষ পর্যন্ত তাই হল।

আমাকে তাকফির করার যে কারণ হিসেবে সে উল্লেখ করেছিল, আমি নাকি শারিয়াহর বাইরে গিয়ে বিচার চাওয়ার (কোন কাফির ভুমিতে থাকা অবস্থায় কাফির আদালতের কাছে বাধ্য হয়ে কোন কারণে বিচার চাওয়া – যেমন বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে ছেলেমেয়েকে পিতামাতার কাছ থেকে আলাদা করে দেয়ার বিরুদ্ধে আপিল করা) অনুমতি দিয়েছি (নাউজুবিল্লাহ)। একদিন এক প্রশ্নের উত্তরে আমি এই বিষয়ে বলেছিলাম যে, এটা হচ্ছে ‘ইস্তিনসার’ (জুলুম প্রতিরোধ করা), এবং এটা ‘তাহাকুম’ (বিচার-ফয়সালা চাওয়া), মত-বিরোধ, দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে তাগুতের কাছে মীমাংসা চাওয়ার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবেনা। আমার কথার কিছুই সে বুঝতে সক্ষম হয় নি। শাইখ আবু মুহাম্মদ আল মাকদিসি থেকে আমি সম্প্রতি জানতে পারলাম, এই ব্যক্তি এখন কথিত “ইসলামিক স্টেট” এর সাথে আছে, এবং বর্তমানে সে তাদের (“ইসলামিক ষ্টেট) কারাগারে আছে, কোন মুসলিমের সাথে তার মতের অমিল হলেই তাকে তাকফির করার ধৃষ্টতা প্রদর্শনের অপরাধে।

পূর্বের “জামাআতুল খিলাফাহ” (জামাআতুল মুসলিমীন) এর সদস্যরা যে বর্তমান “ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক এন্ড শাম” এ অনুপ্রবেশ করেছে আর পূর্বের এই দলের অনেক মতাদর্শ নতুন এই দল গ্রহণ করেছে-এই ঘটনাটি ছিল আমার জন্য তার একটি প্রমাণপস্বরূপ। আমি জানি এ “জামাআতুল খিলাফাহ” (জামাআতুল মুসলিমীন) দলটি, “যে সর্বপ্রথম খিলাফাহ ঘোষণা করেছে সে খালিফাহ” এই নীতির উপর ভিত্তিত করে, মানুষকে আহবান করতো তাদের নেতাকে বাই’য়াহ দেয়ার জন্য। তাদের এই বিদআতি আহবান বাতিল মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে মতবাদ

“দাওলার” (“ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক এন্ড শাম”) এর মাঝেও প্রবেশ করেছে। কিন্তু দাওলাহ “জামাআতুল মুসলিমীন” এর খলিফাকে গ্রহণ করে নি, বরং তারা “জামাআতুল মুসলিমীনের” এই মতবাদ ও নীতি গ্রহণ করে তার দ্বারা নিজেদের নেতা আবু বকর আল বাগদাদিকে খালিফাহর পোষাকে সজ্জিত করেছে।

এটা হচ্ছে “ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক এন্ড শাম” এর পথভ্রষ্টতা আর গোমরাহির প্রথম উৎস। কিছু লোক যারা এই সংগঠনের সদস্য না এবং “দাউলার” দখলকৃত এলাকার বাইরে অবস্থান করছিল, তারা মানুষকে আহবান করছিল বাগদাদি সাহেবের হাতে খিলাফতের বাইয়াত দেয়ার জন্য (বাগদাদির খিলাফহ ঘোষণার আগেই)। যারা এ বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন তাদের কাছে এই ধরণের কর্মকাণ্ড অজ্ঞতা, অদূরদর্শীতা এবং অরাজকতা সৃষ্টির প্রয়াস বলেই গণ্য হচ্ছিল। কিন্তু এই ধ্যানধারণা এবং মতাদর্শ যে “দাউলা” নামক দলের ভেতরেও ঢুকে পড়েছে এটা সকলের নিকট স্পষ্ট ছিল না। এটা শুধু তাদের নিকটই স্পষ্ট ছিল যারা সেসময় অন্যান্য দল ও “দাউলা” নামক দলটির মধ্যে বিরোধ নিরসনের জন্য নিরপেক্ষ শারীয়াহ আদালত প্রত্যাখ্যান করে “দাউলা” যেসব বক্তব্য দিচ্ছিলো সেগুলো বিশদভাবে বিশ্লেষণ করছিলেন। আমাদের শাইখ আবু মুহাম্মদ আল-মাকদিসি, এমন একজন যিনি তাদের এই রোগ ধরতে পেরেছিলেন। এবং যেহেতু শাইখের সাথে তাদের চিঠির আদান-প্রদান হয়েছে এবং কথোপকথনও হয়েছে, তাই শাইখ তাদের অবহিত করেছিলেন যে তাদের মধ্যে এই ব্যাধি দেখা দিয়েছে। এমনকি তাদের একজন শার’ঈ (অফিসিয়াল বিচারক) তাঁর নিকট নিজের মূর্খতার

বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এভাবেঃ “ইমামত দ্বীনের একটি মৌলিক বিষয় এবং এটি তাকফির ও ঈমানের মানদণ্ড স্বরূপ”। (নাউজুবিল্লাহ)

“দাউলাহ” নামক এই দলে। দ্বিতীয়ত যে দিক থেকে গোমরাহি প্রবেশ করেছে তা হল বিভিন্ন উগ্রপন্থী, তাকফিরি জামাতগুলো থেকে, যারা বার বার হোঁচট খায়, আর নিজেদের গোমরাহির রূপ প্রকাশ করে দেয়। এদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা শুরুর দিকে জিহাদে যোগ দিয়েছিল এবং আমি এমন কয়েকজনের নাম জানি। আর এই লোকগুলোই অন্যদের কুমন্ত্রণা দিয়েছে এবং তাদের বক্তৃতা ঐসব অর্বাচীন যুবকদের উপর খুব প্রভাব ফেলেছে যারা কিনা এমন জায়গা থেকে এসেছে যেখানে তারা হঠাৎ করে জাহেলিয়াত থেকে এই মহান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। ইসলাম গ্রহণের সময় তারা ছিল বিদেশীদের মত। তাই তাদের কেউ একজন যদি সুন্নাহর অনুসারী হয় তবে সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়, অন্যথায় তার সীমালঙ্ঘন হবে ভয়াবহ যেমনটি পূর্বের উলামায়ে-কেরামগন বলেছেন।

একারণেই আপনি দেখতে পাবেন, তাদের অধিকাংশ অনুসারী হল মূর্খ যারা মাত্র কিছু দিন আগে দ্বীন পালন করা শুরু করেছে। আর এই অজ্ঞতার কারণেই তারা দ্বীন ও ‘ইলমী জটিল বিষয়লো বুঝতে অক্ষম। আর এটা তলিবুল ইলমদের জানা কথা যে শারিয়াহ আইন প্রয়োগের বিষয়টি একটি জটিল ফিকহি বিষয়। আসলে একজন ফকিহর (বিচারক) দায়িত্বসমূহের মধ্যে এটাই সবচেয়ে কঠিন বিষয়। তাই কোন একটি নিদির্ষ্ট জামাত অথবা একজন ব্যক্তির জন্য কুফর ও ঈমানের ফতোয়া

কিভাবে একজন অজ্ঞ লোক দিতে পারে যে কি না পানি, অজু ও সালাতের হুকুম (বিধান) জানে না? আমি এই ব্যাপারে অবগত হয়েছি যে, এই লোকগুলোর অনেকেই কোন ব্যক্তি এবং জামাতের উপর কুফরের ফতোয়া আরোপ করার জন্য আমার বক্তব্যকে দলিল হিসেবে ব্যাবহার করছে। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলছে আমার বক্তব্যগুলোই তাদের সীমালঙ্ঘনের কারণ, যেন বিষয়টা এমন যে, আমিই তাদের পথভ্রষ্টতার কারণ। এবং এই লোকলো ভুলে গিয়েছে যে শারিয়াহর মূলনীতিলো, 'আম বক্তব্যগুলোকে দলিল হিসেবে প্রত্যেক জামাত চাইলে নিজেদের ইচ্ছেমতো ব্যাবহার করতে পারে। যেমন খারেজিরা আল্লাহর কালামকে দলিল হিসেবে ব্যাবহার করেছিল। কিন্তু হক এবং বাতিলের মাঝে পার্থক্য হল এই মূলনীতিলো প্রয়োগের শর্ত এবং তার প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে জেনে, সঠিকভাবে সেগুলো প্রয়োগ করা। আর এই পর্যায়ে এসে মানুষের মাঝে পার্থক্য রচিত হয়ে যায়; তাকওয়া ও 'ইলমের উপর ভিত্তি করে তাদের মর্যাদার তারতম্য হয়।

হিংসুক ও বিদ্বেষভাবাপন্ন কারও সাথে বোঝাপড়া করার সময় এটা নয়, না হলে এই অধম আরও অনেক কথাই বলত। কিন্তু যারা আমাকে ভালোভাবে চিনে এবং আমার বক্তব্য গভীর বিশ্লেষণ সহকারে পড়ে তারা এই লোকগুলোর মিথ্যাচার ও আমার প্রকৃত বিশ্বাসের মাঝে পার্থক্য করতে পারবে। আর যারা আমাকে জানে তারা এ বিষয়েও অবগত যে, কোন ব্যক্তি এবং জামাতকে কাফির সাব্যস্ত করার বিষয়কে হালকা ভাবে নেয়া, যথেচ্ছ তাকফির করা, ইত্যাদি বিষয়ে আমি কতটা কঠোর। সৌভাগ্যবশত এটাই আমার জন্য যথেষ্ট যে, আমি সবসময় এই ধরণের

অজ্ঞতা প্রতিরোধ ও প্রকাশ করে দেয়ার চেষ্টা করেছি এবং জিহাদি আন্দোলনে যেন এসব প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য অনেকবারই এগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। আমি আজ প্রায় ১৩ বছর ধরে কারাবন্দী। জিহাদের এই কণ্ঠাকাকীর্ণ পথের সামনের সারির অগ্রজ সৈনিক, যারা এই পথের হেফাজত করেছে এবং জিহাদের দ্বার উন্মুক্ত করেছে, তাদের প্রায় সবাই তাদের রবের নিকট শহীদ হিসেবে চলে গিয়েছেন। আর তাদের মধ্য থেকে খুব অল্পই কয়েকজন এখন আমাদের মাঝে আছেন, যারা এই পথের প্রকৃতি ও মূলনীতি সম্পর্কে জানে। আর তাদের বেশীরভাগই কারাবন্দী অথবা পলাতক।

চলার পথে যা বাড়ার তা ঠিকই বেড়েছে এবং বিদ'আত ও ভুল-ভ্রান্তির পরিমাণ অনেক হয়ে গেছে। বিদ'আতি, উগ্রপন্থী এবং নতুন বাতিল ফেরকা যেমন জামাআতুল খলিফা (জামাআতুল মুসলিমীন) সাধারণ মানুষ এবং বিদেশী তরুণ যারা কিছুদিন আগে জাহেলিয়াত থেকে উঠে এসেছে, তাদের মনযোগ আকর্ষণ করতে, এবং তাদের মধ্যে নিজেদের মতাদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। এরা সাধারণত বিদেশী হয়ে থাকে যারা উগ্রপন্থা ও পথভ্রষ্টতার মূল উপাদান। ঠিক যেমন তারা অদূরদর্শীতা ও প্রজ্ঞাহীনতার প্রতিচ্ছবি। আর এই কারণেই প্রতিদিন নতুন কিছু শুনাটা অবাক হওয়ার মত কোন বিষয় নয়।

যদি এই অধম মুক্ত থাকত তাহলে লড়াই সমানে-সমান হত, কিন্তু কোন নাসিহাহ পাঠাতে চাইলে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে পাঠাতে হয়। আর ক্রমাগত আপনার মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করা হয়। আর বেশীরভাগ ক্ষেত্রে

যা হয়, এমন কাউকে মুক্ত করে দেয়া হয়, যে যেখানে সেখানে তার অজ্ঞতা জাহির করে বেড়ায়,আর এই অসুস্থ আত্মাগুলো আপনার উপর এমন অপবাদ আরোপ করে যার দোষে সে নিজেই দুষ্ট। অথচ সে তার অবস্থান থেকে জানে যে, ইসলামের দুশমনদের জন্য সে এমন এক 'কার্যকরী ভাঁড়' যার কর্মকাণ্ড তারা আনন্দের সাথে দেখে এবং মানুষকে জিহাদের কাফেলা থেকে দূরে রাখার জন্য তার এই উগ্রপন্থা আল্লাহর দুশমনদের জন্য 'তুরুপের তাস' স্বরূপ। কেননা সফলতা ইনসাফ এবং সৎকর্ম ছাড়া অর্জন করা যায় না, যেমনটি আল্লাহু সুবহানু ওয়া তা'আলার আদেশ। আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হল, ভাইয়েরা আমাকে প্রচুর অনুরোধ পাঠায় আর এগুলো একই সাথে ব্যথা ও ভালবাসা বহন করে। এবং চোখের পানি ফেলা আর 'যদি আমি পারতাম' বলা ছাড়া আমার অন্য কোন উত্তর থাকে না। আমার অবস্থা বর্ণনা করতে গেলে বলতে হয়ঃ

"যদি আমি পারতাম", কিন্তু "যদি" কি কখনোকোন উপকারে এসেছে?
হায়! যদি তারুণ্য বিক্রি করা হতো, তবে নিশ্চয় আমি তা কিনতাম।

আর যদি ব্যক্তি কিছু লিখেও থাকে, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, কিভাবে সে এটা পাঠাবে? আর যদি সে পাঠায়, তাহলেও বা কিভাবে সে মানুষের প্রশ্নের ও যারা মতভেদ করবে তাদের উত্তর দিবে? এবং কিভাবেই বা সে তার ভাইদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে যারা তাকে উপদেশ দেয়, "লিখা বেশি বড় করবেন না, যতক্ষণ আমরা তা পাঠাতে সক্ষম না হই"। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি এই বিশ্বজগতের প্রতিপালক। খিলাফাত প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলতে হয়, প্রত্যেকের এটা জানা থাকা

উচিত যে এটা আহলে সুন্নাহর জন্য নতুন কোন বিষয় নয়। সালাফগণ এবং পূর্বতন আহলুল ‘ইলম এই বিষয়ে উপসংহার জানিয়ে গিয়েছেন এবং এর সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি জিনিসের শর্ত ও মৌলিক বিষয় উল্লেখ করে গেছেন। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ইসলামের ইতিহাসে অনেক বিপর্যয় এসেছে। তাই এই বিষয়ে উলামায়ে-কেরামগণ অনেক কিছু লিখে গেছেন।

খিলাফত প্রসঙ্গে আহলুস সুন্নাতের ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীতে যুগে যুগে বিদ’আতি, পথভ্রষ্টদের বিভিন্ন ধারণা এবং কথিত “খিলাফাহ” দেখা দিইয়েছে। তাই খিলাফত বিষয়ক আলোচনা অনেক পুরনো ও প্রসিদ্ধ। আর তাই আজ এই লেখক আপনাদের যা বলছে তা আহলুস সুন্নাহর দীর্ঘদিনের বক্তব্যের পুনরুচ্চারন মাত্র। কিংবা বলা যায়, সে পূর্বযুগের নীতিগুলোকেই আজকের নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা। এই গবেষণাপত্র আজকে যে লিখতে বসেছে সে মনে প্রাণে এমনটাই কামনা করে। আমি এই কথা এ জন্যই বলছি কেননা আমি এই নতুন ফিরকার (জামাআতুল মুসলিমীন) আদি রহস্য ব্যাখ্যা করেছি, এবং আমি আগেই বলেছি যে, তাদের গোমরাহি এখন “ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক এন্ড শাম” নামক দলটির মধ্যেও প্রবেশ করেছে। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি আজ এই দলও (দাউলাহ) দাবি করছে, যে একমাত্র তারাই সঠিক পথ প্রাপ্ত এবং অন্যান্য ইসলামিক দল বিশেষ করে জিহাদী জামাতগুলো কলুষিত হয়ে গেছে। আর তাদের দাবি মতে, এর কারণ হল খিলাফাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও বিশ্বাস (“সঠিক ধারণা ও বিশ্বাস” বলতে তারা

আসলে নিজেদের ভ্রান্ত ও বিদ'আতি বিশ্বাসকে বোঝায়) জিহাদি জামা'আগুলোর প্রতিষ্ঠাতা ও নীতি নির্ধারকদের মধ্যে ছিল না ও নেই।

জামাআতুল মুসলিমীনের 'খলিফা'র সাথে কথোপকথনের দিন সে আমাকে এরকমই বলেছিল আর "ইসলামিক স্টেট" এর তথাকথিত অফিসিয়াল মুখপাত্র সেই মূর্খ আদনানিও ঠিক এই কথাই বলেছে বিজ্ঞ ডাঃ আইমান আল জাওয়াহিরিকে উত্তর দেয়ার সময়। এই মূর্খ বলেছে সকল বিবাদ-দন্ধ নিরসনের উপায় হচ্ছে খিলাফতের ঘোষণা দেয়া। খিলাফত সম্পর্কে তাদের প্রথম ঘোষণা থেকেও এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। কারণ সে ঘোষনায় মূর্খ বলেছিল মুসলিমদের বাকি থাকা সব আশা পরিপূর্ণ হবে খিলাফত ঘোষণার মাধ্যমে। বিষয়টা যেন এছাড়া মুসলিম উম্মাহ-র বাকি সব আশা পূরণ হয়ে গেছে।

শুরুতেই আমি আমার ভাই-যারা উপদেশ গ্রহণ করেন এবং সত্যান্বেষী, তাদের জানিয়ে দিতে চাই, এই ঘোষণা মূর্খদের সাথে সংঘাতের ক্ষেত্রে কোন মৌলিক পরিবর্তন আনবে না। তাই এটা কখনই বাগদাদি ও আদনানি সাহেবের গ্রুপ কিংবা যারা তাদের সাথে আছে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করবে না। ঠিক তেমনিভাবে এটা অজ্ঞদের আস্ফালনকে দুর্বলও করবে না। জিহাদি জামাতগুলো সব একই পথে ছিল, বরং তাদের অনেকেই এক জামাতের অধীনে কাজ করত। আর তা হচ্ছে বিজ্ঞ ডাক্তার সাহেবের হাতে বাই'য়াতবদ্ধ থাকা। তাই 'খিলাফত' এর পদবিটি আমদানি করে বসলেই দ্বীনের দুশমনদের সাথে যুদ্ধের অবস্থার কোন পরিবর্তন

হবে না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই অনিষ্টকর ঘোষণা মুজাহিদদের পরস্পরের মাঝে লড়াইয়ের দিকে ঠেলে দিবে।

আর এই ঘোষণার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল ইয়েমেন, সোমালিয়া, আলজেরিয়া, কাভকাজ, আফগানিস্তান, মিশর এবং শামের দেশগুলোতে লড়াইরত জিহাদি জামাতগুলো। তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করেই, তাঁদেরকে লক্ষ্য করেই, তাঁদেরকে দলে ভিড়ানোর জন্যই এ ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সাধারণ মুসলিমদের জন্য নয়। তাই এই ঘোষণা তাদের (জামাআতুল বাগদাদি) জন্য দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য ঘটনাগুলোর মতই একটি ঘটনা। এ কারণেই এর অনিষ্ট বাস্তব রূপ ধারণ করছে আর এর মাধ্যমে ভাল কিছু আসবে না কেননা এ ঘোষণা দেয়াই হয়েছে কতৃত্ব ও নেতৃত্ব অর্জনের উদ্দেশ্যে। আর কতৃত্ব ও নেতৃত্বের জন্য যুদ্ধ করাই ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ বিপর্যয় গুলো ডেকে এনেছে। আসলে একজন মুসলিম চাইলে ইসলামিক ইতিহাসের যেকোন কিছু নিয়ে গর্ব করতে পারে।কিন্তু যখন মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে নেতৃত্বের বিষয়টি আসে, তখন সে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাস দেখতে পায়। সে দেখতে পাবে পারস্পরিক বিদ্বেষ এবং সীমাহীন রক্তপাত - দুনিয়ার জন্য করা অনেক কিছু কিন্তু আখিরাতের জন্য সামান্যই।

“স্টেট” নামধারী এ দলটি যা করেছে তা হল, জিহাদী জামাতগুলোর কর্তৃত্বের ব্যাপারেতাদের ও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীর (তানজীম আল-ক্বাইদা) মাঝে চলমান বিরোধকে রক্তপাতের দিকে নিয়ে গেছে এবং তারা তাদের এই হারাম রক্তপাতকে বৈধতা দেয়ার জন্য একটি অজুহাত তৈরি করে

নিয়েছে (নিজেদের “খিলাফাহ” ঘোষণার মাধ্যমে)। এজন্য তারা ”বুগাত” (বিদ্রোহি) এর ফিক্বহটি ব্যবহার করছে। একারনেই আমরা দেখি চরম মূর্খ আদনানি তার বক্তব্যে “বুগাত” এমন ইঙ্গিতই প্রদান করেছে। যারা তাদের আনুগত্য করবে না, তাদের হুমকি দিয়েছে এই বলে যে, এর শাস্তি হচ্ছে রক্তপাত এবং হত্যা। শুধু তাই নয়, এই জাহান্নামের কুকুরগুলো, তাদের ইমাম ও নেতাদের সাথে মতভেদ কেউ করলেই তাদেরকে কাফির সাব্যস্ত করে, ঠিক যেমনটা আমরা এর আগে ‘জামাআতুল আল-খালিফা’র (জামাআতুল মুসলিমীনের) বেলায় দেখেছি। তাদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে যা জামাআতুল মুসলিমীনের ক্ষেত্রে হয়েছে। যদিও এধরনের বিষয়গুলো সরাসরি তারা প্রকাশ করে না। বরং ধীরে ধীরে তাদের অপকর্মের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে তা প্রকাশ পায়। যেমনটা আমরা দেখেছি, খিলাফত ঘোষণার আগে জাবহাত আল নুসরার সাথে প্রথমত তাদের বিরোধ ছিল সাংগঠনিক বিষয় ও নেতৃত্ব নিয়ে। কিন্তু পরবর্তীতে তারা আল নুসরাকে তাকফির করলো এবং তাদের রক্তকে হালাল ঘোষণা করলো। যে কেউ এধরণের বাতিল ফেরকাগুলোর ইতিহাস বিশ্লেষণ করবে, সে দেখবে শারিয়াহর দলিল ও দ্বীনের এমন মনগড়া ব্যাখ্যার প্রবণতা নতুন কিছু না, এ ধরণের লোকদের পক্ষে এরকম জঘন্য কাজ খুব সহজ।

আসলে বাগদাদি যা চেয়েছিল, যদি সে সত্যিই এই সংঘটনের নিয়ন্ত্রনকারী হয়ে থাকে-যদিও এই বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, কারণ এমন অনেক ইঙ্গিত আছে যা দেখে আমার মনে হয় এই লোকের অবস্থা মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আল কাহতানির থেকে ভিন্ন কিছু নয় যাকে

নিয়ন্ত্রন করতো জুহায়মান। নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে এমন কিছু মানসিক দুর্বলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যা বাগদাদীকে আদনানি এবং অন্যদের আনুগত্য করতে বাধ্য করছে। এই ধরণের চাঞ্চল্যকর তথ্য আমার কাছে এসেছে এবং এর সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য সম্পর্কে আমি অবহিত হয়েছি। যাই হোক, আমি বলব, আসলে বাগদাদি চেয়েছিল খিলাফত ঘোষণার মাধ্যমে, তাদের এবং জাবহাত আল নুসরা এর মাঝে শামে জিহাদের নেতৃত্ব নিয়ে যে বিরোধ হয়েছে তাতে এক চালের মাধ্যমে বিজয়ী হবার, বিশেষ করে, ডাঃ আইমান এর হাতে তার কোন বাইয়াত ছিল না, এই মিথ্যে যখন উন্মোচিত হয়ে গেল। সে চাচ্ছিল এমন একটা চাল দিতে যার মাধ্যমে সে শামের জিহাদের নেতৃত্ব পেয়ে যাবে, আবার নিজের মুখও বাঁচাতে সক্ষম হবে।

বাগদাদি এখন শীতনিদ্রায় আছে তাই কোন জবাব দিতে পারছে না। তাই গালিগালাজে ও কাঁদা ছুড়াছুড়িতে ওস্তাদ এমন কেউ তার জায়গা দখল করে নিয়েছে। আসলে এই জামাত আলেম-উলামা শুন্য হওয়ার কারণে এই বিষয়ে শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলবে এমন কেউ নেই। তাই যখন তাদের কেউ কথা বলতে আসে তখন সে ধ্বংস ও বিপর্যয় ডেকে আনে। ফলস্বরূপ চিৎকার-চেঁচামেচি আর হত্যার হুমকি ধামকি দেয়া ছাড়া তারা আর অন্য কিছু দেখাতে পারে না।

আর সমস্যা সমাধান আর মুখ বাঁচানোর এই চাল, যেটাকে তারা মনে করছে মুসলিম উম্মাহর সকল সমস্যার সমাধান এবং তাদের স্বপ্ন পূরণ– এই ঘোষণা –এটা অজ্ঞদের খুশি করবে, কিন্তু এটা সমস্যাকে আরও

প্রকট করে তুলবে এবং কোন নিঃসন্দেহে রক্তপাত বৃদ্ধি করবে। আর এর মাধ্যমে আপনি শুরু থেকেই জানবেন, আল্লাহু সুবহানুওয়া তা'আলার মনোনীত জীবনবিধানে এর ফয়সালা কি (অর্থাৎ যেহেতু এই ঘোষণার ফলাফল হল অধিক রক্তপাত, তাই শুরুতেই বোঝা যায় যে এই ঘোষণার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র দ্বীনের ফয়সালা হল, সে হল বাতিল)।

তাই আপনি যদি কোন বিষয়ের হুকুম জানতে অক্ষম হন তাহলে এর ফলাফলের দিকে দেখুন। ভেবে দেখুন যাদের রক্ত প্রবাহিত হবে তারা মুজাহিদ, এটা মুরতাদ বা জিন্দিকের রক্ত নয়। তাই বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন, ধার্মিক এবং প্রজ্ঞাবান লোকেরা এই সিদ্ধান্তের ("খিলাফাহ" ঘোষণা) একটি উত্তম বিকল্প প্রস্তাব করেছিলেন, আর তা ছিল সন্ধিতে পৌঁছান। এবং তার পর সেই সন্ধির উপর ভিত্তিকরে এমন কোন সমাধানের পথ বের করা যা সাহাবায়ে-কেরাম (রাঃ) এর নীতিবিরোধী হবে না, যা আমি শীঘ্রই ব্যাখ্যা করব।

আপোষের সমস্ত ইন্তেজাম হয়ে গিয়েছিল এবং আপোষে পৌঁছা যেত, যদি এদের মাঝে ধার্মিকতা, সহানুভূতি, জ্ঞান ও উত্তম আদব-আখলাক থাকত। শারিয়াহর আলোকে বিবাদ মীমাংসা করার জন্য তাদেরকে অনেকবার ডাকা হয়েছে। কিন্তু তারা অহংকারের বশবর্তী হয়ে এই আহবান প্রত্যাখ্যান করেছে কেননা তারা তাদের জামাতকে 'স্টেট/রাষ্ট্র' ঘোষণা করে বসে আছে আর তাদের এজন্য নাকি এটা সমাচীন নয় যে তারা কোন ছোট গ্রুপের সাথে বিচার-ফয়সালা করার জন্য বসবে! তাদের মধ্যকার জ্ঞানের মিথ্যা দাবিদার ছদ্মবেশী মিথ্যুকরা তখন অজুহাত

দেখালো যে, ইসলামের ইতিহাসে কোন রাষ্ট্র/স্টেট, বিচার-ফয়সালার জন্য কোন সংঘটনের সাথে বসে নি। যদি এই লোকেরা আল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতা'আলার এই আয়াতটি পড়ে দেখতঃ

যদি মুমিনদের দুটি দল.........সুরা হুজুরাত (৪৯:৯)

এবং এর সাথে যদি এই আয়াত প্রসঙ্গে মা আয়িশা (রাঃ) এর ব্যাখ্যাও দেখে নিত তাহলে তারা কখনও কুরআন সুন্নাহর ব্যাপারে এরকমক মিথ্যা বলত না। যদি তারা নবীজি (সাঃ) এর জীবনীটা পড়ে দেখত তবে দেখতে পেত কিভাবে বনি কুরাইজার ইহুদীদের ব্যাপারে নবীজি (সাঃ) সা'দ ইবন মুয়াজ (রাঃ) এর ফয়সালা মেনে নিয়েছিলেন। যদি তারা ইতিহাস পড়ে দেখত তবে দেখতে পেত কিভাবে সঠিক পথ প্রাপ্ত খলিফা আলি ইবন আবু তালিব (রাঃ) তাঁর এবং মুয়াবিয়া (রাঃ) এর মাঝে সমস্যার ব্যাপারে নিরপেক্ষ শারীয়াহ আদালতের মীমাংসার ফয়সালা মেনেই নিয়েছিলেন। কিন্তু এই হচ্ছে এই গ্রুপের এ 'শারঈদের অবস্থা (বিচারক)' যাদের অজ্ঞতা এই বিপর্যয় ডেকে এনেছে।

একজন মুসলিম (শাইখ এখানে নিজের প্রতি ইঙ্গিত করছেন) যে কিনা সারা জীবন শরীয়তকে বিজয়ী ও আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করার জন্য কাজ করেছেন, তাঁর জন্য ক্রমাগত এটা মুখে বলা জরুরি না, যে তিনি চানমুসলিম ভুমিতে খিলাফত ফিরেআসুক এবং শারীয়াহর শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক যাতে করে মুসলিম উম্মাহ যে সুফল থেকে এতোকাল বঞ্চিত হয়েছে, তা তারা পুনরায় ফিরে পাক, এবং যে অজ্ঞরা এখানে ক্ষমতায়

অধিষ্ঠিত তারা বিতাড়িত হোক। এট বার বার মুখে বলার কিছু নেই, কারণ নিতান্ত বিপথগামী অথবা আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতাকারী ছাড়া আর কেউ খিলাফাহর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করবে না। তাই বিরোধটা ইমামত ও খিলাফতের শারঈ ভিত্তি নিয়ে নয়, যেহেতু এই বিষয়ে সবাই একমত এবং ফিকহের কিতাব ও ইসলামী রাজনীতির সকলে কিতাবগুলোতে এ বিষয়গুলো উল্লেখিত আছে।

তেমনিভাবে, যা ঘটছে (বাগদাদীর "খিলাফাহ" ঘোষণা) তা সে সমর্থন করে না, সাহাবী (রাঃ) এর বুঝ, ফুক্বাহা ও আলেমদের বক্তব্যের ব্যাপারে যা সে জানতে পেরেছে, তার সাথে বাগদাদীর এই ঘোষণার কোন মিল নেই – এ ঘোষনা দেয়ার সময় ব্যক্তির (শাইখ আবারো নিজেকে বোঝাচ্ছেন) জন্য এটা বলা জরুরি না যে দলে দলে বিভক্ত হওয়া শারীয়াতে নিন্দনীয়। এবং এও তার আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই যে একই সাথে দুই জন খলিফা থাকার অনুমতি নেই, যদিও পূর্বযুগের এ বর্তমান যুগের কোন কোন আলেম একে বৈধ বলেছেন, কিন্তু যারা এরকম বলেছেন তারা এ ব্যাপারে ভুল বলেছেন। বরং এসবের পরিবর্তে এ ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এই জামাত ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে এবং বিভক্তি সৃষ্টি করেছে। কিন্তু যিনি এখন এসব লিখছেন তিনি এদের উত্থানের মাঝে অনেক কল্যাণ এবং জিহাদি জামাতগুলোর উপর আল্লাহর ঐশ্বরিক রহমত দেখতে পাচ্ছেন।

এর ব্যাখ্যায় আমি বলবঃ আসলে জিহাদি আন্দোলনের জন্ম এক বিশেষ পরিস্থিতিতে হয়েছে এবং এই পথ জিহাদি আন্দোলনের অনেক নেতাকে

গ্রাস করেছে। তারা হয় তাদের রবের নিকট চলে গিয়েছে নয়ত কারাবন্দী। যে সকল আলেম তাদের বিরোধীতা করে তারা মুজাহিদদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে না এবং তাদের প্রতি তারা সামান্য সহানুভূতি, ভদ্রতা ও ভালবাসাও দেখায় না। বরং তাদের বিরুদ্ধে তারা ইসলামের শত্রুদের পক্ষালম্বন করে এবং সত্য-মিথ্যা বলে ও সংশয় তৈরি করে তাদের উপর আক্রমণ করতে থাকে। তাই এই দুই পক্ষের মধ্য পরস্পরের প্রতিঅন্তরে কাঠিন্যসৃষ্টি হয়েছে এবং যে পথের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে সংযোগ ঘটতে পারে তা এই পারস্পরিক কাঠিন্যের কারণে শুকিয়ে গেছে।

ফলস্বরূপ দেখা গেল, মুজাহিদগণ এই সব আলেম-উলামা যারা তাদের বিরোধীতা করে তাদের মুনাফিক মনে করে যারা তাদের দ্বীনকে জালিম শাসকের নিকট বিক্রি করে দিয়েছে। আর এসব আলেম-উলামারাও মুজাহিদরা হকের উপর আছে বলে মনে করে না। আর তাই তাদের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা চিৎকার-চেঁচামেচিতে পরিণত হয়, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজের কথা ছাড়া অন্য কারও কথা শুনতে পায় না। এ ধরণের বিব্রতকর পরিস্থিতিতে বাড়াবাড়ি বৃদ্ধি পায় এবং সঠিক পথ হতে বিচ্যুতি তীব্রতর হতে থাকে অথচ সাধারণ মানুষ শুধু সহজ বিষয়গুলোই বুঝে, আর তাইএ আলোচনার ‘আম কিছু বক্তব্য ছাড়া আর কিছুই তাদের বোধগম্য হয় না, কারণ তাদের দৌড় এতটুকু পর্যন্তই। আর এই পথটা (জিহাদ) হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন পথ যেহেতু এই পথে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে হয় এবং ভালো-মন্দ মিশে থাকে যা আলাদা করা কঠিন হয়। আসলে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে মানুষের কর্মকাণ্ডে

সবচেয়ে বেশী বৈচিত্র দেখা যায়। যদি কেউ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনী পড়ে তাহলে সে দেখতে পাবে যে, যুদ্ধ ও জিহাদের ময়দানে সবচেয়ে জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

এবং আজকে ইসলামপন্থীদের মাঝে অনেকেই আছে যারা বিশ্বাস করে যে ইসলামের এমন অনেক দিক আছে যে বিষয়ে আমরা ইজতিহাদ করতে পারি, ইসলামের এমন অনেক দিক আছে যা আমরা আবিস্কার করতে পারি, যা সালাফগণ করেন নি। আর এই প্রবণতা আধুনিক সালাফি আন্দোলনের মাঝেও দেখা যাচ্ছে, আর এর ফলে ‘ইলমের যে দুটি অক্ষ আছে; পঠন ও শ্রবণ, সে দুটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

আর এ প্রবণতা যখন জিহাদি আন্দোলনের মধ্যে প্রবেশ করেছে তখনতা ধোঁয়াটে পরিস্থতিত্র সৃষ্টি করেছে। আর যেহেতু জিহাদের পরিবেশ হল হত্যা আর লড়াইয়ের পরিবেশ সেহেতু কর্তৃত্ব দানকারী পদগুলো যদি আলেমশুন্য হয়, তবে তা চরম্পন্থার এক উৎসমূলে পরিণত হয়। আর যে কেউই আলজেরিয়ার পরিস্থিতি অবলোকন করেছে এ বিষয়টা সে বুঝতে পারবে। আর আজকে আমরা আমরা আদনানী আর তার সমগোত্রীয়দের কণ্ঠে এই একই সূর শুনতে পাচ্ছি।

আর যেমনটা আমরা জানি, এই পথের দৈর্ঘ্য আর সময়ের সাথে সাথে অবস্থার পরিবর্তন, উত্থান-পতন, যাদের মধ্যে চরমপন্থার ঝোঁক আছে তাদের মধ্যে ব্যাধি সৃষ্টি করবে। আর আল্লাহ্‌র সুন্নাহ হল, তিনি বিভিন্ন দল ও জাতিকে ফিতনায় ফেলেন– তাদের পরীক্ষা করেন। আর সে

অমোঘ নিয়মেই জিহাদের এই পথেও ফিতনা আপতিত হয়েছে, ফলে যা হবার তা হয়েছে, বিশেষ করে চরম্পন্থার ক্ষেত্রে ফিতনা হয়েছে। আর যাদের মধ্যে চরমপন্থা আছে তারা না বুঝে, নিজেরা অর্থ তালাশ না করে কিছু বক্তব্যের সাধারণ অর্থকেই শুধু গ্রহণ করেছে।

নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে এই ফিতনা মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য আসে। আর এই পরীক্ষার ফলে মর্যাদার ভিত্তিতে মানুষকে পৃথক করা হয়। এর জন্য চরম মূল্য দিতে হয়, কিন্তু এমনটা প্রয়োজন। আর মহান আল্লাহ তা'আলার রহমতে যা ঘটেছে তাতে আমি মোটেও দুঃখিত নই, বরং আমি এতে আল্লাহর হিকমাহ দেখতে পাচ্ছি যে, এর মাধ্যমে এই পথ (জিহাদ আন্দোলন) থেকে চরমপন্থা, বিপথগামীতা ও পথভ্রষ্টতা দূর হচ্ছে। নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষ মুজাহিদ আর চরমপন্থিদের পার্থক্যটা বুঝত না কারণ সাধারণ মানুষজন জিহাদের এ ব্যাপার নিয়ে সাধারণ মানুষ চিন্তা করতো না।

কিন্তু বর্তমানে এই পার্থক্য (মুজাহিদ আর চরমপন্থিদের মাঝে পার্থক্য) জনপ্রিয় এবং সুপরিচিত। আর এই ব্যক্তি (লেখক) আল্লাহর প্রশংসা করে বলে যে কোন মন্দ, বিদআত বা পথভ্রষ্টতা তার উপর আরোপিত হয় নি, যদিও সংখ্যার দিক দিয়ে এধরণের লোকেরাই বেশি হয় এবং তারাই লোকদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। কুরআন আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার আর অনুসরণের নিয়ম শিখিয়েছে। অস্তিত্বের জন্য, আল্লাহ বলেন, “যা কিছু চলে যায় তা সমুদ্রের ফেনার মত আর যা কিছু মানুষের জন্য কল্যাণকর তা জমিনে থেকে যায়।”

সত্য ছাড়া অস্তিত্ব পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে না। আর লোকজনের কাছে যদি মনে হয় যে এই মিথ্যার ঢেউ আর ফেনা এমনি প্রবল যে সব কিছু লণ্ডভণ্ড হহয় যাবে, তাহলে এই ব্যক্তি (শাইখ নিজে) বলবে, সে তার জীবনে এমন অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ করেছে। এইসব ফেনা আর ক্ষণিকের বিস্ফোরণ তাকে এখন আর প্রভাবিত করে না, এসবই হল বুদবুদ যা অবধারিত ভাবেই একসময় বাতাসে মিলিয়ে যাবে, লোকসংখ্যা দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া শিশু সুলভ মানসিকতার অধিকারী লোকেরা আর কেউ এসবের ধোঁকায় পড়বে না। আর অনুসরণের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তা’আলা বলেন, “মন্দ আর ভাল কখনও সমান নয়, যদিও মন্দের প্রাচুর্য তোমাদের আনন্দিত করে।”

আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা’আলার, যিনি জ্ঞানার্জনের পথের শুরুতে আমাকে এমন একজনের অধীনে শিক্ষা গ্রহণের তাওফীক্ব দিয়েছেন, যিনি আমাকে লোকসংখ্যার আধিক্য দেখে প্রতারিত না হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন.।তা যত বেশিই হোক না কেন আমাকে খতিয়ে দেখার শিক্ষা দিয়েছেন।

আর এখন সময় এসেছে পরিশুদ্ধি আর পরীক্ষার, আর অবধারিত ভাবেই এতে সৃষ্টি হবে বিভাজন ও দুর্বলতা। কিন্তু ধৈর্য, স্থিরচিত্ত হৃদয় আর সঠিক বুঝ থাকলে ইনশাআল্লাহ্ এর ফলাফল হবে নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আজ আমরা দেখছি ত্রুটিপূর্ণ দলগুলো একত্রিত হচ্ছে আর তারা তাদের দিকে আকৃষ্ট করবে সেসব ব্যক্তিকে যারা নিজেদের নফসকে অনুসরণ করে। যারা নিজেদের আর তার ভাইদের মধ্যে এ পথে যা

আছে (জিহাদি আন্দলনের নেতৃত্ব, কতৃত্ব ও ক্ষমতা) তা নিজেদের কামনা করে, আর এ সুযোগে সে চায় নিজের লালস চরিতার্থ করার এবং যা সে অন্তরে গোপন করেছিল তা প্রকাশ করে দেবার। যে ব্যক্তি নেতৃত্ব ভালোবাসে, কিন্তু কোন কারণে হারিয়েছে, এই লোকদের (জামাআতুল বাগদাদী) মাঝে তা সে খুঁজে পাবে (অর্থাৎ সে নেতা হতে পারবে)। আর বিদআতি ব্যক্তি যে জ্ঞান থেকে বঞ্চিত সে এই লোকদের মাঝে থেকে সেই পথ খুঁজে পাবে যা তাকে নেতৃত্ব দেবে আর শক্তিশালী করবে। আর এই লোকেদের প্রথম ঘোষণাই (যে জাবহাত আন নুসরাহ হল তাদের বাহু আর সিরিয়া শামে তাদের শাখা) যখন ছিল কামনারই অনুসরণ, পরবর্তীতে তারা কি করবে? আর যে চিন্তাশীল ও উপলব্ধি করতে সক্ষম ব্যক্তি বুঝতে পারবে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কিভাবে তাদের কাজকর্মে কামনার অনুসরণ প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে। কিভাবে দ্রুততার সাথে নাফস ও প্রবৃত্তির অনুসরণ তাদের মধ্যে প্রসার পেয়েছে, যার কারণে শেষমেশ তারা এক কল্পিত খিলাফাহ ঘোষণা করে বসে আছে।

সত্যিকার অর্থেই কিছু পরীক্ষা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ। আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের মালিক আল্লাহ তা'আলার জন্য। ইসলামী আইনে 'ইমামতে উজমা' (খিলাফত) সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা না করে, আমি কিছু বিষয় এমনভাবে তুলে ধরতে চাই যা অনেকের উত্থাপিত অনেক প্রশ্নের উত্তর দেবে এবং ঐসব জ্ঞাননহীন অজ্ঞ ব্যক্তি যারা আগপিছ না ভেবেই এই দলে যোগ দেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় তাদের গোমরাহির বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেবে। আর সাফল্য একমাত্র আল্লাহ্‌র সাথেইঃ

১) ক) নামসমূহের প্রযোজ্যতা তথা যথার্থতা নির্ভর করে উদ্দিষ্ট বাস্তবতা ও অর্থের উপর। কোন নামের সাথে যে অর্থ ও দায়িত্ব সমূহ সংযুক্ত সেগুলো কার্যকর হবে না, প্রযোজ্য হবে না, যতক্ষণ নাম যারা যে অর্থ উদ্দিষ্ট তা বাস্তব দ্বারা প্রতিফলিত হচ্ছে। [যদি নামকরণের মাধ্যমে যা উদ্দেশ্য করা হচ্ছে, তার বাস্তব অস্তিত্ব না থাকে তবে, সে নামকরণকে যথার্থ বলা যায় না। যেমন মরুভূমিকে প্রাসাদ নামকরণ যথার্থ নয়।] “খিলাফাহ” নামটি হল একটি technical composition। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরন হচ্ছে কি না, এর দ্বারা এর বাস্তবতা উপলব্ধি করা যায়। আর যখন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অপূর্ণ থাকে, তখন তা হল উক্ত নামের দ্বারা উদ্দিষ্ট বাস্তবতার অনুপস্থিতির পরিচায়ক। আর এই স্বাভাবিক বিষয়টিকে কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষের পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আর এ বিষয়টি পাশকাটিয়ে কেউ যদি নিছক কোন দাবিকে খিলাফাহ হিসেবে মেনে নেয় তাহলে সে সুস্থ বিবেকসম্পন্ন নয়।

সুতরাং এই ‘ইমামতে উযমা’ (প্রধান ইযমা) আর ‘খিলাফাহ’ একটি বাস্তব অস্তিত্বের সাথে জড়িত পদবি এবং নামাবলী, যা একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ বহন করে। এটি সালাত, যিকর, হজ্জ ও সাওম এর মত শুধুমাত্র একটি ইবাদাত নয় যা কেবল মাত্র উক্ত ইবাদাতের উদ্দেশ্যেই করা হয়। [*অর্থাৎ সালাতের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সালাত আদায়। হাজ্জের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র হাজ্জ করা। কিন্তু খিলাফাতের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র খিলাফাতের প্রতিষ্ঠা করা কিংবা ঘোষণা করা। বরং কিছু বাস্তব উদ্দেশ্য ও লক্ষ এবং শর্তও পূর্ণ করা।] বরং বেশিরভাগ আলেম খিলাফাহর ব্যাপারে এই মত প্রকাশ করেছেন যে - ‘ইমামের কর্মকাণ্ড (অর্থাৎ এগুলোর ভালোমন্দ)

নির্ভর করে আয়ত্তাধীন লোকজনের কল্যাণের উপর’। সুতরাং ইমামের কর্মকাণ্ডের পেছনে অবশ্যই কোন উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্য থাকবে আর যখন তা না থাকে, তবে সে তখন আর ইমাম বা খলিফা নামেরও হকদার থাকবে না। আর ফিক্বহের নিয়ম থেকে পাই ‘দ্বীন ইসলাম যেটাকে সার্বিকভাবে নিষিদ্ধ করেছে, সেটার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশও কখনো বৈধ হবে না।’

অর্থাৎঃ কোনকিছুর মধ্যে যদি মাকসাদ আল শারীয়াহ, সেই বস্তুর দ্বারা উদ্দিষ্ট মূল দ্বীন উদ্দেশ্য ও নির্যাস অনুপস্থিত থাকে, তবে তার অংশবিশেষ গৃহীত হবে না।

এ বিষয়টা যে বুঝতে সক্ষম সে বুঝতে পারবে, শারীয়াহ নির্ধারিত যেসব উদ্দেশ পূরণের জন্য “ইমামত” অর্পণ করা হয়, তাই যদি কোন নেতার মধ্যে অনুপস্থিত থাকে যাকে ইমামতের বাই’য়াহ দেয়া হয়েছে, তাহলে সেক্ষেত্রে শারীয়াহতে “ইমাম” শব্দের দ্বারা যে অর্থ ও উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করা হয় তা অর্জিত হয় নি। দ্বীনে “ইমাম” দ্বারা যে নির্দিষ্ট অর্থকে বোঝানো হয় তা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য না। [* অর্থাৎ এই ব্যক্তি শার’ই ভাবে ইমাম বলে গণ্য হতে পারে না, যদি সে নামে ইমাম]।

আর এটা হল বিশদ ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে সংক্ষিপ্তাকারে তাদের বিভ্রান্তিকর জবাব, যারা অজ্ঞতাবশত খিলাফতের অস্তিত্বের জন্যে তামকীনের (যমিনে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও কতৃত্ব অর্জন) শর্তকে বাতিল বলে মনে করে। আর এই আলোচনা তার সাথেই সম্ভব, যে ব্যক্তি ফিকহ এবং ফিকহের

মূলনীতি/উসুল সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে, তার সঙ্গে নয় যে এগুলোর ব্যাপারে অজ্ঞ।

খ) রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিচের বক্তব্যটি এ জিনিসেরই সাক্ষ্য দেয়,

(إنما الإمام جنة يقاتل من ور انه ويقتى به)

'নিশ্চয়ই ইমাম ঢালস্বরূপ। তার অধীনেই লড়াই হবে আর তার কাছেই সুরক্ষা চাওয়া হবে।' (সহীহুল বুখারী)

আর এই ঢাল; অর্থাৎ প্রতিরক্ষা ও শক্তি, এর উপকরণসমূহ ছাড়া আসবে না বা অর্জিত হবে না, আর এর উপকরণলো 'শাওকাহ' (শক্তি) আর 'তামকীন' (প্রতিষ্ঠা) নামে পরিচিত। এই হাদিস নির্দেশ করে ইমাম বা খলিফা হতে হলে দুটো জিনিস থাকা আবশ্যকঃ-

প্রথমতঃ 'তার অধীনেই লড়াই হবে' আর দ্বিতীয়ত 'তার কাছেই সুরক্ষা বা নিরাপত্তা চাওয়া হবে'। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার নিয়ম এটাই। আর ফিকহের মূলনীতি বলে, الغرم بلغنم 'লাভ ও ক্ষতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত'। সুতরাং খালিফাহকে মান্য করা হবে কারণ রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন 'তার অধীনেই লড়াই হবে'। সুতরাং তাকে অসাধুভাবে বা মিছেমিছি মেনে নেওয়া হবে না। আর যেহেতু 'তার কাছেই সুরক্ষা চাওয়া হবে' এজন্য তার উপর জনগণের অধিকার আছে। আর নিরাপত্তা তার কাছেই চাওয়া হয় যার ব্যাপারে এই শর্ত পূরণ হয়, অর্থাৎ যার আসলেই সুরক্ষা দেওয়ার সামর্থ্য আছে।

গ) ফিকাহশাস্ত্রে এটি একটি পরিচিত বিষয় এবং শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া (রঃ) “মিনহাজ আস সুন্নাহ” এর সূচনাতে এই বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন যে, নেতৃত্ব হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ এবং তাঁর নেতার মাঝে এক চুক্তি। এবং শরিয়তে ও বাস্তবে চুক্তির মানে হচ্ছে, চুক্তির উদ্দেশ্যে দুটি দল একত্রিত হবে, চুক্তির জন্য কোন নির্ধারিত বিষয় থাকতে হবে (যা বিষয়ের উপর চুক্তি হচ্ছে) এবং দলিল-পত্র থাকতে হবে। আর এগুলোই হচ্ছে চুক্তির মুল স্তম্ভ যা আমাদের উলামাদের কিতাবে উল্লেখ আছে যে বিষয়ে তলিবুল ইলমরা অবগত রয়েছেন। তাই কোন চুক্তি যদি এই শর্তগুলো বা এর উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে এটা চুক্তি বলেই গণ্য হবে না।

ঘ) ইবন তাইমিয়া (রঃ) বক্তব্য সার্বিকভাবে এই সত্যকে তুলে ধরেছে যে, ব্যক্তির নেতৃত্ব আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কোন বিষয় ওয়াহিভিত্তিক পদ কিংবা পদমর্যাদা নয়, বরং এটি মানুষ দ্বারা নির্বাচিত। তিনি আরো বিস্তারিতভাবে বলেছেন যে, এমনকি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যদি কাউকে নেতা নির্বাচন করার জন্য নির্দেশ দিয়ে থাকেন এবং পরবর্তীতে জনসাধারণ এ নির্দেশের বিরুদ্ধে গিয়ে অন্য কাউকে বাইয়াত দেয়, তখন জনসাধারণ যাকে বাইয়াহ দিয়েছে সেইনেতা হিসেবে গণ্য হবে। সে নয় যাকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল কেননা নেতৃত্বের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র জনতা কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তি দ্বারাই হাসিল হতে পারে, অন্য কাউকে দিয়ে নয়। [*শাইখুল ইসলাম সাথে এও বলেছেন, নাবী (সাঃ) এর নির্দেশ না মানার

জন্য এক্ষেত্রে উম্মাহ গুনাহগার হবে, কিন্তু তবুও নেতা সেই তাকবে যাকে জনগণ বাই'য়াহ দিয়েছে।]

ইমাম জনতা কর্তৃক নির্বাচিত-উলামাদের এই বক্তব্য থেকে বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, এটা অন্যান্য সকল চুক্তির মতই যা সম্মতির ভিত্তিতে সম্পাদিত হয় এবং এর অবশ্যই শর্তাবলী ও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকতে হবে ও পূরণ করতে হবে, নতুবা এটি হবে নিরর্থক। কেউ যদি কোন মহিলাকে মিলিত না হওয়ার শর্তে বিয়ে করে তাহলে এখানে বিয়ের কোন মানেই থাকে না। “নিকাহ” শব্দটীর অর্থ আর এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। শর্তের বিষয়ে তাদের বক্তব্য হচ্ছে, (ما كن خارجًا عن الماهية ولا تصح إلابه) “এটি হচ্ছে আলোচ্য বিষয়ের বাইরের এমন কিছু জিনিষ যা ছাড়া বিষয়টি শুদ্ধ হয় না”।এবং তাদের বক্তব্য থেকে আরও বুঝা যায়, المنهي عنه شرعًا كلمعدوم حسًا) “যে বস্তু দ্বীনে নিষিদ্ধ, সেটার অবস্থা এমন যে এর অস্তিত্ব অনুভূত হয় না”।

ঙ) আর এখানে চুক্তির বিষয় হচ্ছে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে প্রতিষ্ঠা,উম্মাহকে নিরাপত্তা প্রদান এবং জিহাদের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকা। এটাই হচ্ছে চুক্তির উদ্দেশ্য। শর্তসমূহ পূরণ করা ছাড়া এ উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করা সম্ভব নয়, যা এ মূর্খ লোকেরা প্রত্যাখ্যান করেছে।

চ)إنماالإمامجنة অর্থঃ “নিশ্চয়ই যা কিছুই হোক না কেন, ইমাম হল ঢালস্বরূপ”

এই হাদিসটি নবীজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই বাণীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ -
(الحج عرفة) "হজ্জ হল আরাফাহ"

আর 'ইন্নামা' শব্দটি অর্থকে সীমাবদ্ধতা করতে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং যাকে আনুগত্যের বাই'য়াহ দেওয়া হয়েছে সে যখন নিজের ভুলত্রুটির কারণে ঢাল অর্থাৎ প্রতিরক্ষা হওয়ার উপযুক্ত থাকে না, অর্থাৎ নিরাপত্তা দিতে পারে না, তখন সে ইমাম হওয়ার মর্যাদা হারায়। আর ইমাম শব্দটির দ্বারা এখানে বুঝানো হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে সমসাময়িক পরিস্থিতির জ্ঞানের আলোকে নেতৃত্ব দান ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনারযোগ্য।

ছ) নেতৃত্বের বাই'য়্যাত ঐক্যমতের ভিত্তিতে হওয়া উচিৎ, এ সম্পর্কে আল ফারুক উমার ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিচের উক্তিটি একটি প্রমাণস্বরূপ,

(من بايع رجلاً من غير مشورة من السلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايع تغرة أن يقتلا) وفي لفظ: (فلا يتابع)

"কোন ব্যক্তি যদি মুসলিমদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করা ছাড়াই কাউকে আনুগত্যের বাইয়্যাত প্রদান করে, তাহলে যাকে বাইয়্যাত দেওয়া হয়েছে বা যে বাইয়্যাত দিয়েছে তাদের কাউকেই মুসলিমরা বাইয়্যাত দেবে না, বরং তাদের উভয়কেই হত্যা করতে হবে।" (ইমাম বুখারী কর্তৃক সহীহ

তে বর্ণিত) অন্য জায়গায় ‘তাকে অনুসরণ করা যাবে না’ বলে উল্লেখ আছে।

সুতরাং ইমামতে উজমার (প্রধান নেতৃত্বের) জন্য শর্ত হল ঐক্যমত এবং জনগণের সম্মতি। উপরের উক্তিতে, ‘মুসলিমদের সঙ্গে শলা পরামর্শ করা ছাড়াই’– অংশটি দ্বারা একথাটিই বোঝানো হয়েছে। আর যে ব্যক্তি যুন-নুরাইন উসমান ইবন আফফান রদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু কে বাইয়্যাত দেওয়ার ক্ষেত্রে আবদুর রহমান ইবন আউফ এর সিরাত বা কার্যক্রম বুঝতে সক্ষম, সে এই বিষয়টিও জানবে যে, সাহাবায়ে কেরামগণ ইমাম (খলিফা) নির্বাচনের ক্ষেত্রে উম্মাহর ঐক্যমতকে শর্ত হিসেবে বিবেচনা করতেন। আর উল্লেখ আছে, “যখন তারা একত্রিত হলেন, আবদুর রহমান ইবন আউফ শাহাদাহ উচ্চারন করলেন এবং বলা শুরু করলেন, ‘হে আলী, আমি সাধারণ মানুষদের বিষয়টা প্রত্যক্ষ করেছি এবং দেখেছি যে তারা উসমানের সমমর্যাদার কাউকেই মনে করছে না। সুতরাং আপনি নিজের বিরুদ্ধে (মানুষের জন্য) পথ/সুযোগ করে দেবেন না।’”

সুতরাং তিনি লোকজনের মতামতকে নেতা নিয়োগের মাপকাঠি হিসেবে নির্বাচন করলেন। এই হাদিসটি সহীহ। বস্তুত আল ফারুক (উমার) (রদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) বুঝতে পেরেছিলেন যে সিদ্দিকি (আবু বকর) (রদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) কে বাই’য়্যাত দেবার ব্যাপারে তিনি যা বলবেন তাতে কিছু লোক তার বিরোধিতা করতে পারে। এবং কিছু মানুষ তাঁর কথা ভুল বুঝেছিল, সুতরাং তিনি উত্তরে বললেন, “এটি একটি অপ্রত্যাশিত ভুল ছিল যার মন্দ প্রভাব আল্লাহ নিবারণ করে দিয়েছেন।”

এবং সাহাবীদের (তাদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন) জীবনে আবু বকর সিদ্দিক (রদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মর্যাদার কারণেই আল্লাহ সেই মন্দ নিবারণ করে দিয়েছেন। [*এখানে মন্দ বলতে বোঝানো হচ্ছে যেভাবে আবু বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বাই'য়াহ দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ তাৎক্ষণিক ভাবে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বাই'য়াহর পর উপস্থিত অন্যান্য সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া ইজমাইন ও বাই'য়াহ দেন। আবু বাকর আস-সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খালিফাহ হওয়াকে মন্দ বলা হচ্ছে না, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয়ার এই পদ্ধতিকে বোঝানো হয়েছে] আর এটা তাঁর সেই বক্তব্যকে পূর্ণ করে, 'আল্লাহ, তাঁর রাসুল, এবং মুমিন বান্দারা (আবু বকর ছাড়া অন্য কারও নেতৃত্ব) মেনে নেবে না'। সুতরাং মহা পবিত্র আল্লাহ তা'আলার সম্মতিও ভাগ্যক্রমে চলে এসেছিল।

জ) আর এই চুক্তি হল প্রতিনিধিত্বের চুক্তি। সুতরাং উম্মাহ তাদের প্রতিনিধি হিসেবে এমন কাউকে নিয়োগ দেবে যে নেতৃত্ব ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালনের জন্য ইমাম হবেন। কারণ কুরআন তাদের উপর আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের দায়িত্ব ফরয করেছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"ইঞ্জিল কিতাবধারী লোকেরা যেনো আল্লাহর দেওয়া আইন অনুযায়ী বিচার করুক" (সুরাহ আল মায়িদাহ, ৫:৪৭)

কিন্তু যেহেতু সবার পক্ষে এই কাজটি করা সম্ভব নয়, সেহেতু তারা তাদের মধ্য থেকে এমন কাউকে নির্বাচন করবে যিনি তাদের এই দায়িত্ব

পূরণ করবেন। আর এই চুক্তির মাধ্যমে ইমাম তাঁর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সহায়ক প্রয়োজনীয় শক্তি পাবেন। সুতরাং মুসলিম উম্মাহ হল তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা।

ঝ) আর যেহেতু অভিজ্ঞ, নেতৃস্থানীয় ও কতৃত্বশীল লোকের হাতে শাসনভার ন্যাস্ত করা অস্তিত্বের রীতি- কারণ সকল বিষয়ে তারা উম্মাহর প্রতিনিধি -সুতরাং উম্মাহর মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিদেরই এ সকল আসনে বসা উচিৎ। এদের মধ্যে শূরা হবে এবং এরাই হলেন উম্মাহর আহলুল হাল ওয়াল আকদ (উম্মাহর পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী), অর্থাৎ উম্মাহর সমস্ত সিদ্ধান্ত ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের দায়িত্ব তাদের উপর ন্যাস্ত। আর সেই সাথে এই বিষয়টিও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে, এ ব্যাপারে (ইমামাহ) সকল সিদ্ধান্তের ভার উম্মাহর হাতেই আছে, অন্য কারও নয়।

আর যদি কোন দল বা জামা’আ এই প্রতিনিধিত্বকে ছিনিয়ে নেয়, হোক তা ইমামের কাছ থেকে অথবা আহলুল হাল ওয়াল আকদ এর কাছ থেকে, তাদের জন্য এই পদবীগুলো (খিলাফত, খিলাফাহ) আর কোন অর্থ বহন করবে না। না তাদের ইমাম (খালিফাহ) অলে গণ্য হবে, আর না তাদের আহলুল হাল ওয়াল আকদ এই নামের উপযুক্ত বলে গণ্য হবে। আর মহা পবিত্র আল্লাহর দ্বীনে নেতৃত্বের বিষয়টা ঠিক এমনই।

ঞ) আর ফকীহদের কিতাবে যেসব বিশেষ বিপর্যয়পূর্ণ পরিস্থিতির কথা উল্লেখিত হয়েছে, যেমন, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জোরপুর্বক উম্মাহর

নেতৃত্ব গ্রহণ করা, ক্ষমতা দখল করে নেওয়া [তাঘাল্লুব]; এগুলো দ্বীনের মৌলিক মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সুতরাং বাস্তবে বা প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এগুলো [তাঘাল্লুবের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত] গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু যেখানে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলের পর, ক্ষমতা দখলকারীর মাধ্যমে শারীয়াহ ও ইমামতের উদ্দেশ্যসমুহ পূরণ হয়, সেক্ষেত্রে দুর্দশা ও নেতৃত্ব নিয়ে আরো সংঘাত এড়ানোর জন্য এতে সম্মতি জানানো জায়েজ। কারণ নেতৃত্ব নিয়ে সংঘাত, ক্ষমতার লড়াই, এগুলো হল অস্তিত্বের কঠিনতম পরীক্ষা যেগুলোর কারণে প্রতিটি রাষ্ট্র, সম্প্রদায় এবং দলে প্রচুর রক্তপাত হয়।

ট) আর যদি এ ব্যাপারগুলো অনুধাবন করতে সক্ষম হন, তবে আপনি যাচাই করে দেখতে পারবেন যে, যা দাবি করা হচ্ছে তা সত্যি না মিথ্যা। তাছাড়া আপনি এই বিষয়ে ব্যবহৃত নামগুলোর (ইমামাত, ইমাম, খিলাফাহ, খালিফাহ) অর্থ, বাস্তবতা এবং এ সম্পর্কে কিছু মানুষের অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি সম্বন্ধেও জানতে পারবেন।

২)ক) মহান আল্লাহ তা’আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا)
وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن
وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ
(إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা দিয়েছে, তারা একে অপরের সহায়ক। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি তাদের বন্ধুত্ব তোমাদের প্রয়োজন নেই যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। অবশ্য যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় নয়। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সেসবই দেখেন।” [সুরাহ আল আনফাল, ৮:৭২]

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু ” [সূরাহ আত তাওবাহ, ৯:৭১]

খ) যেমনটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, কুরআন মু’মিনদের মধ্যে দুই ধরণের মৈত্রীর কথা নিশ্চিত করেছে। প্রথমটা হল বিশ্বাসের ভিত্তিতে মৈত্রী আর তা প্রকাশিত হয়েছে আল্লাহর এই বাণীতেঃ

“আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু ” (সূরাহ আত তাওবাহ, ৯:৭১)

দ্বিতীয়টা হল রাজনৈতিক মিত্রতা। আর বর্তমানে তা নাগরিকত্ব হিসেবে পরিচিত। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রে নগরিকত্বের শর্ত দুইটি। একঃ ইসলাম, দুইঃ হিজরত। আর একারণেই রাষ্ট্রের অধীনে থেকে বা অভ্যন্তরে থেকে বাই'য়াহ দেয়া প্রয়োজন বা আবশ্যক। প্রথম আয়াতে [আল আনফাল, ৮:৭২] এই মৈত্রীর নিয়ম কানুন বলা হয়েছে। আর এতে নিচের বিষয়লো নিশ্চিত করা হয়েছেঃ

- যারা হিজরত করেনি এটি তাদের ইমানের পক্ষে একটি প্রমাণস্বরূপ। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

"আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি" (সূরাহ আল আনফাল, ৮:৭২)

-একই সাথে এই আয়াত এটাও প্রমাণ করে যে, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে তাদের [যেসব ইমানদার হিজরত করেনি] সাহায্য করা আবশ্যক, যদি তাদের সাথে কোন রাজনৈতিক চুক্তি না থাকে, তাও। শর্ত একটাইঃ যেসব মুশরিকের সাথে ইমামের চুক্তি হয়েছে, এই জিহাদের মাধ্যমে সেসব মুশরিকদের ক্ষতি করা যাবে না, কিংবা চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে না।

-এই আয়াত আরও প্রমাণ করে যে ফিকহের শর্তসমূহ মেনে মুশরিকদের সাথে শান্তিচুক্তি করা বৈধ। মহান আল্লাহ বলেছেন, "কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে" (সূরাহ আল আনফাল, ৮:৭২)

- ঈমানদারদের দলগুলোর মধ্যেও যে রাজনৈতিক বিভাজন হতে পারে এই আয়াত তারই প্রমাণ। এই আয়াত আরও প্রমাণ করে যে ইসলামে মুহাজির (যারা হিজরত করেছে) দের যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া আছে, যদি তাদের এজন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আল বলছেন -

"অবশ্য দ্বীনের ব্যাপারে যদি তারা তোমাদের সহায়তা কামনা করে," [সূরাহ আল আনফাল, ৮:৭২]

আর এই কাজ নেতৃত্বের দায়িত্বসমূহের অংশ, এবং বিধানকর্তা (আল্লাহ্‌) এটা জায়েজ করেছেন সে দলের জন্য যে দল ইমামদের কতৃত্বের অধীনে নেই। সহিহ হাদিসে এর প্রমাণ বিদ্যমান। হুদাইবিয়া সন্ধির পর আবু বাসির (রদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ঘটনাটি, বর্ণিত আছে, "তখন রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় ফিরে গেলেন আর আবু বাসির, কুরাইশদের একজন, সে মুসলিম হিসেবে তার কাছে চলে এল। তখন কুরাইশরা দুজন ব্যক্তিকে পাঠিয়ে তাকে ফিরিয়ে দেবার দাবি জানিয়ে বলল, 'আপনি আমাদের সাথে যে চুক্তি করেছেন, সে অনুযায়ী তাকে এই দুজনের সাথে পাঠিয়ে দিন' তো তারা তাকে নিয়ে গেল আর যুল হালিফায় গিয়ে থামল। তখন তারা মাটিতে বসে নিজেদের সঙ্গে থাকা খেজুর খেতে লাগল। তখন আবু বাসির তাদের দুজনের একজনকে বলল, 'ওয়াল্লাহি, তোমার তলোয়ার টা তো দেখি খুব সুন্দর, একদম নিখুঁত।' তখন ঐ ব্যক্তি তলোয়ারটা বের করে বলল, 'হ্যাঁ, ওয়াল্লাহি এটা আসলেই নিখুঁত,। আমি এটা বারবার ব্যবহার করেছি।' আবু বাসির বলল, 'দেখি

একটু তোমার তলোয়ারটা’। তলোয়ারটা হাতে পাওয়া মাত্র সে ঐ ব্যক্তিকে আঘাত করল আর সে মরে গেল। অন্যজন মদীনায় পালিয়ে গেল। তখন রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে দেখে বললেন, ‘নিশ্চয়ই সে ভয়ঙ্কর কিছু দেখে এসেছে।’ সে রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে গিয়ে বলল, ‘আমার সাথীকে মেরে ফেলা হয়েছে, ওয়াল্লাহি আমাকেও হয়ত মেরে ফেলা হবে।’ তখন আবু বাসির এসে বলল, ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ, ওয়াল্লাহি আপনি আপনার ওয়াদা পূরণ করেছেন। আমাকে তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন আর আল্লাহ আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।’ রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ‘তার মা ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক, সে তো যুদ্ধের আগুন বাঁধিয়ে দিল। যদি তার সাথে আর কেউ থাকত।’ একথা শুনে সে বুঝতে পারল যে রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে আবার তাদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। এজন্য সে পালিয়ে সমুদ্র উপকূলে চলে গেল। আরও বলা আছে, ‘আবু জান্দাল বিন সুহাইল পালিয়ে এসে তার সাথে যোগ দিল আর তারা একটি দল গঠন করল। ওয়াল্লাহি, কুরাইশদের এমন কোন বাণিজ্যিক কাফেলার কথা শোনা যায়নি যেটা শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে কিন্তু পথিমধ্যে তারা কাফেলাটিকে আক্রমণ করে সবাইকে হত্যা করে সম্পদগুলো ছিনিয়ে নেয় নি।’” [সহীহ আল বুখারী ও সহীহ আল মুসলিম]।

সুতরাং এই হাদিস নিম্নোক্তবিষয়গুলো ব্যক্ত করেঃ

* প্রথম আয়াতে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজনের যেসব সম্ভাব্য কারণের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো ছাড়াও আরও কিছু কারণ থাকতে পারে। এমন এক্ষেত্রে কারণটা ছিল- মুসলিমদের একটি নির্দিষ্ট দলভুক্ত লোকজনের একটি চুক্তির (এক্ষেত্রে হুদাইবিইয়ার চুক্তি) প্রতি আনুগত্য যা অন্যান্য মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য নয়। আর মদীনার দলটি ছাড়া অন্য দলটি ছিল আবু বাসির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দল।আর এই দলটি মূলত ইমামের কার্যক্রম ও জিহাদ পরিচালনা করেছিল।

* ইবন তাইমিয়্যাহ (আল্লাহ তাকে রহম করুন) এই হাদিসটিকে দলীল হিসেবে পেশ করে এই মতামত দিয়েছেন যে মুসলিমদের কোন এক শাসক কাফিরদের সাথে যেসব চুক্তি করেছেন অন্যান্য শাসকগণ সেসব চুক্তি মেনে চলতে বাধ্য নন। সুতরাং এই মতামতের ভিত্তিতে সমসাময়িক সেসব মতামত বাতিল হয়ে যায় যেখানে আবু বাসিরের ঘটনাটিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে চিত্রায়িত করার চেষ্টা চালানো হয়।

* যেহেতু চুক্তিবদ্ধ দলের জন্য দ্বীনের ব্যাপারে অন্যদের সাথে যুদ্ধের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত চুক্তিটির জন্য অনুসরণ করা বৈধ, তেমনি দ্বিতীয় দলটি, যারা চুক্তিবদ্ধ নয়, চুক্তির আওতায় নয়, তাদের জন্যও জিহাদ চালিয়ে যাওয়া বৈধ।

গ) যদিও এসব দলাদলি ইসলামের মূলনীতির বিরুদ্ধে, কিন্তু বাস্তবতার কারণেই এসব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, যেমনটা আমরা দেখেছি। অন্যথায় এক্ষেত্রে মহান আল্লাহ দেওয়া মূলনীতি হল,

“তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ কর আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।” (সূরাহ আল ইমরান, ৩:১০৩)

ঘ)এসব কিছু প্রমাণ করে যে মুসলিমদের জন্য সর্বদা, সকল পরিস্থিতিতে একজনের কাছেই আনুগত্যের বাইয়্যাত বাধ্যতামূলক করে দেওয়া কখনই ঠিক নয়। আর বাইয়্যাত ভঙ্গকারীদের হত্যার অনুমতি দেওয়ার কথা যে বলে সে নিঃসন্দেহেই পথভ্রষ্ট। আর সত্যিকার অর্থেই সে জাহান্নামের কুকুর হিসেবে বিবেচিত হবে যদি সে বাইয়্যাত ভঙ্গকারীদের কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করে বা তার নেতার আনুগত্য করাকে দ্বীনের একটি মূলনীতি বানিয়ে নেয়। আর হিজরত ও বাই'য়াহ থেকে বিরত থাকা ব্যক্তিদের ঈমানের বিষয়টি (অর্থাৎ মুসলিম হিসেবে গণ্য হওয়া) প্রথম আয়াতটি [আনফাল, ৭২] দ্বারা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে।

ঙ) আবদুল ক্বায়েস এর ব্যাপারে নিচের হাদিসটি বলে,

“আবদুল ক্বায়েস এর প্রতিনিধি দল যখন রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে পৌঁছল, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘এরা কারা?’ বা ‘এরা কার প্রতিনিধি?’ তারা উত্তর দিল, ‘রাবিয়াহ এর লোকজন’। তিনি বললেন, ‘এদের’ বা ‘এই প্রতিনিধিদের’ ‘স্বাগতম, কোন অপমান বা অনুতাপ ছাড়াই’। তারা বলল, ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ, হারাম মাসগুলো ছাড়া অন্যান্য সময়ে আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না। আপনার ও আমাদের মাঝে এই মুযার কাফিরদের বসতি রয়েছে। সুতরাং আমাদের একটি চূড়ান্ত হুকুম দিন যা আমরা আমাদের পেছনের লোকজনদের

জানাব আর যা আমাদের জান্নাতে নিয়ে যাবে।’ আর তিনি আদেশ করলেন, ‘তোমরা গণিমতের এক পঞ্চমাংশ দান কর” (ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত, সহীহ)

আর এখানে

* রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের হিজরত করতে বলেননি। বরং তিনি তাদের নিজ নিজ এলাকায় অবস্থান করাকে অনুমোদন দিয়েছিলেন। আর এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাধ্যতামূলক হিজরত তাদের জন্য নয় যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, ‘আমরা এই জমিনে দুর্বল ছিলাম’। আর যদি তারা তাদের দ্বীন প্রকাশ করতে সক্ষম হয় তখন এই বাধ্যবাধকতা তাদের উপর আরোপিত হবে। আর এই বিষয়টি ইমাম ও তার দলের লোকজনের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল।

* ‘তোমরা গণিমতের এক পঞ্চমাংশ দান কর’ এই কথার দ্বারা বোঝা যায় যে, তিনি তার নিজের অধীনে থেকে তাদের নিজ নিজ বিচার বিবেচনার আলোকে জিহাদ করার অনুমতি দিয়েছিলেন, যদিও তাদের অঞ্চল বিচ্ছিন্ন ছিল।

* আবদুল ক্বায়েস এর প্রতিনিধি দল আর আবু বাসিরের ঘটনা- এ দুটো বিষয় পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে যতক্ষণ নেতৃত্বপূর্ণ জিহাদ চলবে ততক্ষণ তা বৈধ; তা ইমামের অনুমতিক্রমে এবং তার অধীনেই

পরিচালিত হোক, অথবা ইমামের অনুমতি ছাড়া কোন পৃথক ব্যক্তি বা দল করুক।

৩) ইমামের কার্যক্রম মূলত তার সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল, আর এই সামর্থ্য কমবেশি হতে পারে। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো এ ব্যাপারে জানা যায়ঃ

০ আল উক্বাহ [বায়াতুল আক্বাবা] তে যে বাইয়্যাত নেওয়া হয়েছিল তার মূলনীতি। এর বিষয়বস্তু ছিল রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতিরক্ষা। অর্থাৎ, তাকে প্রতিরক্ষা দেওয়া হবে যদি মদীনায় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয় বা কোন বহিঃশত্রু মদীনাতে তাকে আক্রমণ করে। আর মুসনাদে আছে, উবাদা ইবন সামিত বলেছেন,

“নিশ্চয়ই আমরা রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এর কাছে বাইয়্যাত দিয়েছি, অলস থাকি বা কর্মক্ষম থাকি, তার কথা শুনব আর মানব, সচ্ছলতা ও অচ্ছলতা উভয় অবস্থায় দান করব, আর সৎকাজের আদেশ করব আর অসৎ কাজে নিষেধ করব, আল্লাহর কথা বলব ও নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া করব না, আর রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সাহায্য করব যখন তিনি ইয়াছরিবে আমাদের নিকট আসবেন, যেভাবে আমরা আমাদের নিজেদের ও স্ত্রী সন্তানদের সুরক্ষা দিই এবং আমাদের জন্য থাকবে জান্নাত। আর এই ছিল রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে বাইয়্যাত যা আমরা দিয়েছিলাম।” (ইবন কাছির এই হাদিস এর ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন, এর সূত্র অনেক ভাল।)

০ বদরের সময় মদীনার লোকদের নেতা হওয়া সত্ত্বেও, মদীনার নেতা হিসেবে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর, আনসারদের মতামত প্রয়োজন ছিল যখন তিনি কাফেলা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন আর স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ হতে যাচ্ছে। এই হাদিসটি বুখারি ও মুসলিমে আছে আর বিস্তারিত আছে আহমাদে,

“রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বদরে যাওয়া নিয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করলেন, আবু বকর বদরের দিকে ইঙ্গিত করলেন, তিনি আবার পরামর্শ করলেন এবং এবার উমার ইঙ্গিত করলেন, তিনি আবার পরামর্শ করলেন, আর তখন আনসারদের কয়েকজন বলল, ‘রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা চান। সেই সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আপনি যদি আমাদের মহাসমুদ্রে ডুব দিতে বলেন আমরা ডুব দেব।’” (ইমাম বুখারী, থেকে বর্ণিত, সহীহ)

০ যুন-নুরাইন (উসমান রদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) এর হত্যাকান্ডের পর আলী (রদিয়য়াল্লাহু তা’আলা আনহু) এর সাথে যা হল। ফিতনা ও অক্ষমতার কারণে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকলেন। বিষয়টা ত্বলিবুল ইলমদের জানা আছে, তাদের উপর বাকিটা ন্যাস্ত থাকুক।

৪) ক) আল ফারুক, উমার (রদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এই নিয়মটি উল্লেখ করেছিলেন, উপরে ১)ছ এ উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলঃ

"কোন ব্যক্তি যদি মুসলিমদের সঙ্গে শলা পরামর্শ করা ছাড়াই কাউকে আনুগত্যের বাইয়্যাত প্রদান করে, তাহলে যাকে বাইয়্যাত দেওয়া হয়েছে বা যে বাইয়্যাত দিয়েছে তাদের কাউকেই মুসলিমরা বাইয়্যাত দেবে না, বরং তাদের উভয়কেই হত্যা করতে হবে।" (ইমাম বুখারী, থেকে বর্ণিত, সহীহ)

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমামের কাছে বাইয়্যাত দেবার দায়িত্ব শুধু এক, দুই বা তিনজনের হাতে ন্যাস্ত নয়। বরং এও প্রমাণিত হয় যে কাউকে এক দলের লোকজন কাউকে বাইয়্যাত দেবার পরপরই বাই'য়াহদানকারীরা অন্যদের উপর তা জোরপূর্বক আরোপিত করতে পারবে না। আর তাদের অনেকেই এই বিষয়টা সম্বন্ধে অজ্ঞ, যে কারণ তারা মনে করেছে যখনই কিছুসংখ্যক লোক বাইয়্যাত দিয়ে দেবে, তখনই শার'ই ভাবে খিলাফাহ- এর যে অর্থ যা প্রযোজ্য হয়ে যাবে এবং একে মেনে নেয়া সব মুসলিমদের কর্তব্যে পরিণত হবে। আর আল ফারুক মুসলিমদের সঙ্গে শলা পরামর্শ বিহীন কোন বাইয়্যাতের সাথে একমত হতে নিষেধ করেছেন। আর এই বিষয়টাও স্পষ্ট যে এখানে 'মুসলিম' বলতে কেবল জ্ঞানী ও অন্তরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই বোঝান হয়েছে যাদের আহলুস শূরা ও আহলুল হাল ওয়াল আকদ হিসেবে অভিহিত করা হয়। আর এই আল-ফারুকের এই নির্দেশ অনুযায়ী, বাইয়্যাত দেওয়া লোকজন যদি বিরোধী লোকজনদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তা আরও মারাত্মক

পথভ্রষ্টতা; কারণ এই বাইয়্যাতের সাথে একমত না হয়ে যে আল ফারুকের হুকুম মেনেছে সে বিরোধিতার নয় বরং প্রশংসার যোগ্য।

সুতরাং এমন ব্যক্তির সাথে যে লড়াই করবে সে আল ফারুকের ফিকহের (মত/বুঝ) বিরোধিতাই করবে। আর বলা বাহুল্য যে উপরোক্ত কথাটি আল ফারুক প্রবীণ সাহাবীদের উপস্থিতিতেই বলেছিলেন আর কেউ তার বিরোধিতা করেননি, কারণ নিজ নিজ জ্ঞানের আলোকে তারা বুঝেছিলেন যে এটাই হল আল্লাহর দ্বীন আর অন্য সব কিছুই হল অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার দ্বীন।

খ) আর যখন কোন জাতি এমন একটা পর্যায়ে থাকে যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তাদের শক্তি সঞ্চয় ও প্রয়োগ করা প্রয়োজন, যেমনটা আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি - যেখানে এক দল কোন এক অঞ্চলের উপর এবং অঞ্চলবাসীদের উপর কতৃত্বশীল, আর অন্য কোন দল অন্য কোন অঞ্চল ও অঞ্চলবাসীর উপর – এরূপ অবস্থায় যেকোনো একদলের নেতা অগ্রবর্তী হয়ে নিজেকে নেতা দাবি করে বসলে, অন্যদের বাদ দিয়ে নিজেকে একচ্ছত্র খলীফা ঘোষণা করলে সমস্যার সমাধান হবে না [অর্থাৎ এ ঘোষণার মাধ্যমে রাতারাতি ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে না]। এধরণের চিন্তাধারার বাস্তবায়নের চেষ্টা অনেকটা শিশুসুলভ আচরণ ও অপরিপক্কতার পরিচায়ক, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বিবেচনাবোধের বহিঃপ্রকাশ নয়। আর এমন বক্তব্য দানকারী ব্যক্তি মনে করছে এ বিষয়টি [খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা] ক্ষমতা দখল আর অন্যদের পূর্বে নিজেকে খলীফা বলে দাবি করার সাথে সম্পৃক্ত। কতই না হতভাগ্য সে ব্যক্তি যার বিবেচনাবোধ এই

মাপের!

গ) তাদের (জামাআতুল বাগদাদী) অনেকের মুখে রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই বক্তব্যটি শোনা যায় –

“বনী ইসরায়েলকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিত নবীগণ। যখনই কোন নবী মারা যেতেন, অন্য একজন নবী তার জায়গায় বসতেন। আর আমার পর আর কোন নবী আসবে না, খুলাফা চলবে আর তারা সংখ্যায় অনেক হবে। তারা জিজ্ঞেস করল, ‘তো আপনি আমাদের কি করতে আদেশ করেন?’ তিনি বললেন, ‘প্রথমজনদের বাইয়্যাতের অঙ্গীকার পূর্ণ কর আর আল্লাহ তাদের যে হক দিয়েছেন তা আদায় কর। কারণ নিশ্চয়ই যে দায়িত্ব তারা নিয়েছে আল্লাহর কাছে তাদেরকে সেজন্য জবাবদিহি করতে হবে।’” (ইমাম মুসলিম, থেকে বর্ণিত, সহীহ)

কিন্তু এই হাদিসটি তাদের কর্মকাণ্ড ও অবস্থানেরপক্ষে প্রমাণস্বরূপ নয়, কারণ-

০ এই হাদিস খুলাফাদের বিষয়ে বলা হয়েছে যারা শাসনকার্য পরিচালনা করছেন। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের উপর তাদের কর্তৃত্ব আছে।কিন্তু এই হাদিসের বক্তব্য এরা নিজেদের ইছেমতোএমন এক ব্যক্তির (বাগদাদী) উপর আরোপ করেছেযার কোন কতৃত্ব নেই। এবং সে এবং তার দল নিজেদেরকেই রক্ষা করতে পারে না সম্পূর্ণ উম্মাহকে নিরাপত্তা দেয়া তো দূরের কথা। [জামাআতুল বাগদাদীর যা কতৃত্ব আছে তা হল ইরাক ও

সিরিয়ার কিছু অংশে। এবন এসব অঞ্চলেও তারা গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত, যেকারনে তারা “আক্রমণ ও পিছু হটা” র (hit & run) নীতি অনুসারে যুদ্ধ করছে। সিরিয়া ও ইরাকের এসব অঞ্চলে তাদের কতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, যে কারনে আমরা দেখেছি সাম্প্রতিক সময়ে তারা বিভিন্ন অঞ্চলে থেকে পিছু হটেছে। তাহলে উম্মাহর উপর, সমগ্র উম্মাহর উপর, কিংবা নিছক উম্মাহর অধিকাংশের উপর তাদের কিভাবে কতৃত্ব থাকতে পারে?] কারণ ঈমানের অবশ্যই রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী এই বানীয় শর্ত পূরণ করতে হবে -‘নিশ্চয়ই, যা কিছুই হোক, ইমাম ঢালস্বরূপ।’

০ এই হাদীস থেকে আরও বোঝা যায়, বাইয়্যাতের অঙ্গীকার রক্ষা করা শুধু তাদের জন্য বাধ্যতামূলক যারা বাইয়্যাত দিয়েছে, বাকিদের জন্য নয়। আর বলাই আছে, ‘প্রথমজনদের বাইয়্যাতের অঙ্গীকার পূর্ণ কর।’ তাহলে কিভাবে এটা বাকিদের জন্য বাধ্যতামূলক হয়?

০ যদি সবার জন্যই বাধ্যতামূলক হয় তবে তো প্রত্যাক দাবিকারির প্রত্যেক দাবিকে মেনে নেয়া সকলের জন্য আবশ্যক হয়ে যাবে। সুতরাং কেউ যদি এই হাদিসে বাই’য়াহ এর অর্থ খলীফার কাছে বাইয়্যাত হিসেবে বুঝে, তাহলে সে নিশ্চিত ভাবেই অজ্ঞ। এ হাদিসের সাধারণ অর্থটাই সঠিক, অর্থাৎ কর্তৃত্বের প্রথম বাই’য়াহ যাকে দেয়া হবে, তার নেতৃত্ব বাকিদের উপর বহাল থাকবে। [অর্থাৎ সর্বপ্রথম যার কাছে বাই’ইয়াহ প্রদান করা হয়েছে, সে বাই’ইয়াহ পূরণ করতে হবে। সর্বপ্রথম যে “খিলাফাহ” ঘোষণা করেছে, তাকে বাইয়াহ দিতে হবে – এমন না।] আর

যদি তারা চিন্তা ভাবনা করত তাহলে বুঝে যেত যে তারা তাদের নেতাকে বাই'য়াহ দেবার ব্যাপারে যে আহবান জানাচ্ছে, সেটাই একটি বাতিল আহবান, কারণ এটা পরবর্তীতে এসেছে। কারণ তাদের এই আহবানের পুর্বেই কয়েকটি আনুগত্যের বাই'ইয়াহ দেয়া হয়েছে, যার মধ্য কিছু বাই'য়াহ প্রদানকারী ও গ্রহণকারী মৃত্যুবরণ করেছেন এবং কিছু জীবিত আছেন। [শাইখ এখানে তানজীম আল-ক্বাইদা তথা শাইখ উসামা ও শাইখ যাওয়াহিরির প্রতি শাইখ আবু মুসাব আল-যারকাউয়ী এবং শাইখ আবু উমার আল বাগদাদি, এবং আবু বাকর আল-বাগদাদির বাই'য়াহর পরতি ইঙ্গিত করছেন। শাইখ উসামা এবং শাইখ যাওয়াহিরি কতৃক আমীরুল মু'মীনিন মুল্লাহ মুহাম্মাদ উমার রাহিমাহুল্লাহকে দেয়া বাই'য়ার প্রতিও তিনি এখানে ইঙ্গিত করছেন।]

আর এসব বাই'য়াহ ছিল দ্বীনের যতটুকু তাদের সামর্থ্যের মধ্যে ছিল তাতে শুনার আর মানার। আর যে আনুগত্যের অঙ্গীকার কারও সামর্থ্যের বাইরে তা অবশ্যই বাতিল, অর্থাৎ মানুষের কাছে ঐ খিলাফতের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার দাবি করা ভুল। এদের [জামাআতুল বাগদাদি] অবস্থা বোঝার জন্য নিচের উদাহরণটি চিন্তা করুনঃ ধরুন একটি দল আছে [তালিবান, আল-ক্বাইদা ও তাদের শাখাসমূহ], যাদের কিছু ক্ষমতা ও কতৃত্ব আছে বিভিন্ন অঞ্চলে, এবং নিজেদের সামর্থ্যের ভেতর শরীয়াহ ভিত্তিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ব্যাপারে তারা অঙ্গীকারবদ্ধ। হঠাৎ এক দুর্বল, অখ্যাত ও নিস্তেজ ব্যক্তির উদয় হল যে কিনা নেতৃত্ব দেওয়া তো দূরের কথা সালাতের ইমামতির করতেও সক্ষম না। আর তখনি আরেকজনের উদয় হল, যে নিজে নেতৃত্বের দায়িত্ব নিতে ও কর্মকাণ্ড

পরিচালনায় আংশিক বা পুরোপুরিই অক্ষম, আর সে এসে এই অখ্যাত ব্যক্তিকে খিলাফতের বাই'য়াহ দিয়ে বসলো, কারণ সে নাকি কুরাইশি। যেহেতু তাদের নিজেদের মতানুসারে সেই প্রথম ব্যক্তি যার কাছে বাই'য়াহ দেয়া হয়েছে, সুতরাং তারা এখন বলতে লাগল যে সকলের জন্য এখন এই ব্যক্তিকে বাই'য়াহ দেয়া বাধ্যতামূলক। এমনকি শক্তি ও ক্ষমতা সম্পন্ন অন্যান্য দলগুলোর জন্যও এই ব্যক্তিকে নাকি বাই'য়াহ দেওয়া বাধ্যতামূলক।

এমন কর্মকাণ্ড আলোচ্য হাদিসটির ব্যাপারে নিদারুণ অজ্ঞতারই পরিচায়ক, করে কারণ এভাবে "খালিফাহঃ শব্দটি ব্যবহৃত হলে শব্দটি তার শার'ই অর্থ ও মর্যাদা হারিয়ে ফেলবে। আর ফিকহশাস্ত্রে সুপরিচিত বিধান হল, যে চুক্তির মুল বিষয়বস্তু হল তার অর্থ আর উদ্দেশ্য, শব্দ বা বাক্য সুতরাং এখানে খিলাফা শব্দটি এমনভাবে 'উপহার' শব্দের সমার্থক যা কোন কিছু পাবার উদ্দেশ্য বা বিনিময়ে দেওয়া হয়।কিন্তু নিঃসন্দেহে একে "উপহার" বলা হলেও প্রকৃত পক্ষে এটি উপহার না বরং একটি বিক্রয়ের লেনদেন। [নয়। আপনার দেখে থাকবেন অনেক সময় দুটি কোম্পানির ক্ষেত্রে চুক্তি বা অর্ডার দেয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়, এক কোম্পানির প্রতিবিধি অন্য কোম্পানির পরতিনিধিকে এই প্রস্তাব দেয় যে, আপনি যদি আমাকে এতো টাকা দেন "উপহার" হিসেবে তবে আমি আপনাদের কোম্পানিকে কন্ট্রাক্টটি পাইয়ে দেবো। ব্যাংক লোন পাবার ক্ষেত্রেও এমনটা দেখা যায়, ব্যাংকের ম্যানেজার বলে আমাকে এতো টাকা দিলে আমি আপনারা লোন পাশ করিয়ে নেবো। আবার আমাদের মতো দেশগুলোতে বড় বড় ব্রিজ বা স্থাপনা তৈরির ক্ষেত্রে যখন আন্তর্জাতিক বাজারে টেন্ডার ছাড়া হয়, তখন

আমাদের মন্ত্রীরা বিদেশি কোম্পানিদের বলে – তোমরা যদি আমাকে এতো টাকা দাও তাহলে আমরা কাজটা তোমাকে দেবো, পদ্মা সেতু, নাইকো বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা এমন দেখেছি। প্রতিটী ক্ষেত্রেই "উপহার" শব্দটি ব্যবহার হলেও এটি আসলে উপহার না, বরং একটি লেনদেন।]

পরিশেষে, 'ইরাকের ইসলামী রাষ্ট্র' নিজেদের 'খিলাফতের ইসলামী রাষ্ট্র' হিসেবে যে ঘোষণা দিয়েছে, তা হল ছলনা এবং প্রতারণা যা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করে বোঝা ও প্রমাণ করা যায়। আর এ ঘোষণা এমন সব দুর্বল মেধার ও স্বল্প জ্ঞানের লোকেদের মস্তিস্কপ্রসূত যারা মূলনীতির সাথে শাখার সংযোগ স্থাপন করতেও অক্ষম। সুতরাং ব্যাখ্যায় আমি বলি-

১) এটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলমানদের সম্মতি আর আহলুল হাল্ল ওয়াল আক্বদের শূরা ও ঐক্যমত ছাড়া কোন নেতা নিযুক্ত হতে পারে না। আর এটাও জানা আছে যে উম্মাহর শক্তি (শাওকাহ) সম্পন্ন ব্যক্তিগণ হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রাস্তায় জিহাদরত মুজাহিদরা, যারা শাম ও ইয়েমেন, আফগানিস্তান, চেচনিয়া, সোমালিয়া, আলজেরিয়া, লিবিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলে আল্লাহর শত্রুদের সাথে লড়াই করছে ও তাদের পরাজিত করছে। খিলাফতের এই বিষয়টি ও এর ঘোষণা তাদের ঐক্যমত ছাড়াই করা হয়েছে। তাদের মুখপাত্রের (আদনানি) দেওয়া বক্তব্য অনুসারে, কেবলমাত্র একটি গ্রুপ (অর্থাৎ তারা নিজেরা) ছাড়া কেউই এই ঘোষণার সময় তাদের বাইয়্যাত দেয় নি। আর আল ফারুকের আদেশ আর উপরোক্ত ফিকহ থেকে এটাও জানা যায় যে

শূরা বিহীন বাইয়্যাত যে দিয়েছে আর যাকে দিয়েছে তাদের কারও সাথেই একমত হওয়া যাবে না, বরং তাদের উভয়ের ক্ষেত্রে ফিকহ হল 'তাদের উভয়কেই হত্যা করতে হবে'।

আর 'ইরাকের রাষ্ট্র' নামে এই গ্রুপের সাধারণ মুসলিমদের উপর এমন কোন কর্তৃত্ব নেইযা তাদেরকে উম্মাহর ব্যাপারে দূর থেকে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার দেয়। এবং তাদের ব্যাপারে যদি ভালো ধারনাও রাখা হয় তবুও উম্মাহর উপর কতৃত্বের ব্যাপারে তাদেরকে গণ্য করা হবে না। কিন্তু তাদের মধ্যে সেসব দোষ বিদ্যমান যেসবের ব্যাপারে আগেই বলা হয়েছে, চরমপন্থা, পথভ্রষ্টতা, নৈতিক অধঃপতন আর রক্তপিপাসা, [যেগুলোর কারণে তাদের ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখা সম্ভব না]। আমি বলি- এই বিষয়ের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা হল মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত অনেক গুলো দলের মধ্যে একটি দল হিসেবে, সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় হিসেবে না। যেহেতু তারাই শুধুমাত্র মুসলিম উম্মাহ না, একারণে তাদের নেতা সমগ্র উম্মাহর উপর খালিফাহ এবং তারা খিলাফাহ বলে বিবেচিত হবে না। সুতরাং আনুগত্যের এই অঙ্গীকার শুধুমাত্র তাদের উপরই বাধ্যতামূলক যারা তাদের অধীনস্ত ছিল বা আছে। আর বাস্তবতা বিবর্জিত নামকরণের ফলে বাস্তবতা বদলে যায় না।

২) এই দলে হুমকি হত্যার হুমকি দিয়েছেযারা মুসলিমদের মধ্যে বিভক্তি করে। কিন্তু এই হুকুম ততোক্ষন প্রযোজ্য হবে না যতক্ষণ না মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য আসছে [অর্থাৎ ঐক্য না থাকলে ঐক্য ভংকারির বিধান কিভাবে কার্যকর হবে?] কারণ রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

বলেছেন,

“যদি তোমরা এক নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাক আর এমতাবস্থায় কেউ যদি তোমাদের ঐক্য বিনষ্ট করার আর তোমাদের বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকট আগমন করে তবে তাকে হত্যা কর।” (ইমাম মুসলিম, থেকে বর্ণিত, সহীহ)

তাঁর এই বক্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার হয় যে এই হুকুম প্রযোজ্য যখন- ‘যদি তোমরা এক নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাক’। এসব লোকজন এই হাদিসটিকে ভিন্ন অর্থে, ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভুলভাবে ব্যবহার করছে।যেহেতু বর্তমানে লোকজন বিভিন্ন দলে বিভক্ত একারণে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা কিংবা বা সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব অর্জনের পর বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ঐক্যমত সৃষ্টি করা ব্যাতিত এই হুকুম প্রযোজ্য না। [অর্থাৎ যদি কেউ পুরো উম্মাহর উপর পূর্নাংগ কতৃত্ব অর্জন করতে পারে, সেক্ষেত্রে সে এই হাদিসের ভিত্তিতে ঐক্য বজার রাখার জন্য, বা ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তি প্রয়োগ করতে পারে।] আর ‘সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব’ বলতে এটা বোঝায় না যে, যারা বিরোধিতা করে তাদের উপর জোরপূর্বক প্রাধান্য বিস্তার বা তাদের সাথে লড়াই করে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে; এই অনুমতি শুধুমাত্র ফকীহগন বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যেই দিয়ে থাকেন। সুতরাং, কোন কিছু ঘটে যাওয়ার পর সেটিকে অনুমোদন দেওয়ার অর্থ এই নয় যে ঘটার আগে সেটিকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। আর শরীয়াহর মূলনীতি অনুযায়ী, ‘শুরুতে যেটিকে বৈধতা দেওয়া হয়নি

পরবর্তীতে সংঘটিত হয়ে যাবার পর কিংবা সংঘটিত হবার সময় হয়ত সেটিকে বৈধতা দেওয়া হতে পারে।’

৩) একমাত্র নিজেদের দল ছাড়া অন্য সকল মুসলিম দলসমূহকে তারা বাতিল ঘোষণা করেছে। তাদের খিলাফাহ ঘোষণার গ্রহনযোগ্যতা সৃষ্টি করা ছাড়া এই জালিয়াতির পিছনে আর কোন কারণ নেই। আর তাদের বিকৃত উদ্দেশ্যগুলো এই ঘোষণার আগেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং ঘোষণা বা তাদের নাম, কোন কিছুরই দ্বারা এদের প্রতি আনুগত্যের বাধ্যবাধকতা, কিংবা দলসমূহের বাতিল হওয়া প্রমাণিত হয় না।

৪) তাদের কর্মকান্ড প্রমাণ করে, বিরোধী দলগুলোর সাথে লড়াইয়ের জন্য তারা কতটা উন্মাদ। কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্ব অর্জন বা অন্য কিছু, কারণ যাই হোক না কেন, এই লড়াই নিশ্চয়ই এক মহা পাপ। আর যদি তারা তাদের বিরোধীদের কাফির ঘোষণা করে (তাকফির করে), তবে নিঃসন্দেহেই তাদের দ্বীন হল খারেজীদের দ্বীন।

৫) তাদের অবস্থান ও কর্মকান্ড দেখে এটা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে তাদের নেতৃত্বস্থানীয় লোকজন হল চরমপন্থি আর বিদআতি। এ বিষয়ে আলোচনা ইতোমধ্যে হয়ে গেছে আর এখন এটা পানির মত পরিষ্কার। তাদের মধ্যে ব্যাপক অজ্ঞতা বিদ্যমান কারণ তাদের মধ্যে কোন আলেম-উলামা নেই, যারা তাদের দাবিকৃত “খিলাফত”-এর হাল ধরতে পারে।

৬) আর যদিও তারা পরবর্তীতে ইরাকে কিছু কর্তৃত্ব অর্জন করতে পেরেছে, আল্লাহ বলেন,

‘আমার (নেতৃত্ব দানের) প্রতিশ্রুতি সীমা অতিক্রমকারীদের জন্য নয়।’ (সূরাহ আল বাকারাহ, ২:১২৪)

আর এই আয়াতের ভিত্তিতে এই উম্মাহর আলেম-ওলামারা প্রমাণ করেছেন যে অত্যাচারী শাসককে কর্তৃত্ব দেওয়া অবৈধ। যদিও সে শাসক নাপাক যিন্দিকদের (কাফির) দমন করে। কারণ যিন্দিকদের দমন এক বিষয় আর ইসলামের রাজনীতি ও নেতৃত্ব অন্য একটি বিষয়।

তাদের অন্তরে তাদের মুজাহিদ ভাইদের প্রতিই কোন দয়া-মায়া নেই, তাহলে কিভাবে তারা দরিদ্র-অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি, তাদের মধ্যকার দুর্বল ব্যক্তি ও তাদের জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে? আমাদের আলেম-ওলামাগণ খারেজী সেনাপতির অধীনেও জিহাদের অনুমতি দিয়েছেন, যেমনটা ইসলামিক মাগরিবে মালিকী ওলামাগণ দিয়েছেন। কিন্তু কোন খারেজী শাসক, যে রাজনীতির বিষয়ের তত্ত্বাবধান ও জনসেবার বদলে কেবল মানুষ হত্যা করতেই বেশি আগ্রহী, এমন কারো শাসনকে উলেমাগণ অনুমোদন দেননি।

৭) যিন্দিকদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই করাটাকে মোটেই ছোট করে দেখা হচ্ছে না, যেহেতু এটি একটি প্রশংসনীয় বিষয়। যিন্দিকদের বিরুদ্ধে যদি তারা একাই জিহাদ করত, এই অধম অবশ্যই তাদের অধীনে থেকে লড়ত। কিন্তু যখন পূর্ব-পশ্চিমের সকল মুসলিমদের উপর তাদের নেতৃত্বের বিষয়টি বিবেচনায় আসবে, তখন বলতে হয় ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ও ‘ইলমি দৃষ্টিকোণ থেকে এই নেতৃত্ব অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আর যদি এদেরকে শাসন দেওয়া হয় তবে তার ফল হবে অত্যন্ত অশুভ।

৮) ইরাকে তারা কিছুটা কর্তৃত্ব অর্জন করার অর্থ এই নয় যে তাদের নেতৃত্বের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। নিশ্চয়ই মোল্লা মুহাম্মাদ উমার তার অঞ্চলের উপর সম্পূর্ণ কতৃত্ব অর্জন করেছিলেন। আর সোমালিয়া, ইয়েমেন ও মালীর মুজাহিদরা তাদের নিজ নিজ ভূখণ্ডে কর্তৃত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর এই মুজাহিদিনেরা উন্নত চিন্তা ভাবনা ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাক্তি যেকারনে এমন অজ্ঞতাপূর্ণ ও বিভ্রান্তিপূর্ণ কাজকর্ম তারা করেন নি। তারা নিজেদের প্রধান খিলাফত হিসেবে দাবি করেন নি, যার প্রতি আনুগত্য পৃথিবীর সমস্ত মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক; কারণ দ্বীনের এই পরিভাষা কেউ পার্থিব স্বার্থে ব্যবহার করে, আর কেউ করে দ্বীনের স্বার্থে। কিন্তু ছাড়া শূন্যতার উপর এই পরিভাষা প্রয়োগ করে [অর্থাৎ খিলাফাত না থাওক্লেও খিলাফাতের দাবি করে] তাদের দ্বীন হল রাফেজী ও বাতেনিদের দ্বীন।

৯) আর তাদের অফিশিয়াল মুখপাত্র, ইরাকে বিজয় লাভের পূর্বেই বিরোধের সূত্র ধরে হাকিম আল-উম্মাহ আল যাওয়াহিরির কাছে খিলাফত ঘোষণার দাবি জানিয়েছিল আর নিজেরাই এই পবিত্র দায়িত্বভার পেতে চেয়েছিল। সুতরাং স্পষ্ট বোঝা যায় যে খিলাফার বিষয়ে তাদের অজ্ঞতা আগে থেকেই ছিল। অতএব, ক্ষমতার স্থিতিশীলতা বা অন্য কোন কিছুই তাদের পক্ষে যুক্তি হিসেবে পেশ করা যায় না। [অর্থাৎ তামক্কীন অর্জনের পর তারা খিলাফাহ ঘোষণায় সচেষ্ট হয়েহে এমন না]

১০) পরিশেষে, মুসলিমদের বিশেষ করে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থানরত মুজাহিদদের হত্যা করার ব্যাপারে তারা যে উন্মাদনা প্রদর্শন করেছে, খিলাফাহ ঘোষণার আগে ও পরে, তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় তারা একটি বিদআতি দল। এই উন্মাদনা এখনো তাদের ভেতর আছে। বরং ইরাকে কিছু কর্তৃত্ব অর্জনের পরএই উন্মাদনা আরও বেড়েছে। যদিও তাদের এই কর্তৃত্ব ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে এক উপহার, আর তাদের অনেকেই একথা স্বীকার করেছে যে, কোন রকম লড়াই ছাড়াই অনেক অঞ্চল তাদের হস্তগত হয়েছে। আর এই অনুগ্রহ পাওয়ার পর উচিৎ কৃতজ্ঞতা, নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ করা, অজ্ঞতা এবং প্রতিপক্ষকে হত্যার উন্মাদনা নয়।

এই অংশটা তাদের জন্য সহানুভূতি সৃষ্টির জন্য বলা হচ্ছে না; এই ব্যক্তি (লেখক) তার জীবনে অনেক বড় বড় পরিবর্তনের দেখেছে। এই দলের চেয়েও মহান ব্যক্তিদের চোখের পলকে পতন ঘটতে দেখেছে। অবশ্য এমনটা তাদের জন্য আমরা আশা করি না, কারণ তারা ধ্বংস হলে

ইরাকে তাদের জায়গা দখল করে নেবে যিন্দিকরা (শি'আ-রাফিদ্বারা)। কিন্তু বিজয় মুমিন বান্দাদের অন্তরে ভয় আর নম্রতা সৃষ্টি করে যেমন আমাদের নেতা রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশের সময় দেখিয়েছিলেন করেছিলেন, আর আল ফারুক (রদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন তার পায়ে কিসরার ধন-সম্পদ এনে রাখা হয়েছিল তখন দেখিয়েছিলেন।

আর আমরা এমন সময়ে বাস করছি যে সময়ের ব্যাপারে রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন অনেক কিছুই ঘটে যাবে একটার পর একটা, অর্থাৎ অল্প সময়ে অনেক কিছু সংঘটিত হবে। আর আল্লাহ ভাল জানেন।

* যেহেতু এটি একটি বিদআতি দল, একারনে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া তাদের অধীনে লড়াই করা বৈধ নয়। আর তাদের বিদআতের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে যখন তারা নিজেদেরই মুসলিম সম্প্রদায় হিসেবে আর তাদের নেতাকে মুসলিম উম্মাহর একমাত্র নেতা দাবি করেছে আর অন্যান্য নেতাদের বাতিল হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। অথচ তাদের এই দাবির কোন বাস্তবতা নেই এবং এই দাবি অর্থহীন। সুতরাং আল্লাহর দ্বীন সম্বন্ধে জানে এমন কারও উচিৎ নয় এই বিষয়ে (খিলাফত ও ইমামত) তাদের সাথে একমত হওয়া। আর এই দলে বিদ্যমান বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ব্যক্তিদের উচিৎ এসব চরমপন্থা প্রতিরোধ করা, যদি তারা নিজেদের ও তাদের ভাইদের কল্যাণ কামনা করে। যেহেতু জয়ের মূল্য, বেদনা আর বোঝাও আছে।

অতএব তাদের উচিৎ সদাচরন করা, অন্যথায় তাদের এবং অন্যদের উপর আল্লাহর কঠিন আজাব আপতিত হতে পারে। নিশ্চয়ই কর্তৃত্বের দিক দিয়ে তাদের চেয়েও অনেক শক্তিশালী দল এই পৃথিবীতে এসেছিল আর তারা ধ্বংস হয়েছে,

“আর আল্লাহর সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশই জানে না।” (সূরাহ ইউসুফ, ১২:২১)

অল্প সময়ে আমি এতটুকুই লিখতে পেরেছি, আর ইনশাআল্লাহ ইলম অণ্বেষনকারীদের জন্য এটুকু যথেষ্ট হবে। আর যে কেউ এই বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে সে সত্য জানতে পারবে, আর আল্লাহই ভাল জানেন।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা’আলার জন্য।